মধ্যশিক্ষার রূপান্তর

কর্মশিক্ষা

(ওয়ার্ক এডুকেশন)

শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

৭৭/২, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

মধ্যশিক্ষার রূপান্তর

কর্মশিক্ষা

(ওয়ার্ক এডুকেশন)

শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

PRINTED IN AUGUST, 1974 (10,000)

SECONDARY EDUCATION REORGANISED

Series I : Work Education (Bengali)

By Satyendra Mohan Chattopadhyay

Price : Re. 1·25

Published by A. C. Biswas, Secretary, West Bengal Board of Secondary Education, 77/2, Park Street, Calcutta-16 and *Printed by* P. K. Hazra, at Sreemudran 40, Shibnarayan Das Lane, Calcutta-6.

—নিবেদন—

দশক্লাশের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় মধ্যশিক্ষার নতুন পাঠক্রমে 'কর্মশিক্ষা' অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অনেকেই জানতে চেয়েছেন, কর্মশিক্ষা কী ও কেন। পশ্চিমবঙ্গের শত শত স্কুলে কিভাবে কর্মশিক্ষার প্রচলন হতে পারে তাও তাঁদের জিজ্ঞাস্য।

বিগত কয়েক মাস ধ'রে নানা আলোচনা-চক্রে এবং শিক্ষকসমাবেশে এবিষয়ে যথাসাধ্য উত্তর দেবার চেষ্টা করেছি। এই কাজে আমায় সাহায্য করেছেন পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, বিশেষজ্ঞ বন্ধুবর্গ এবং পর্ষদের সহকর্মিগণ।

শিক্ষকসমাজের অনুরোধে সেই সকল আলোচনার সারাংশ একটি পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হল। গ্রন্থাকারে লিখতে গিয়ে বিতর্ক বা প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গী হয়ত এসে পড়েছে। তবু মূল বক্তব্যের একমুখিনতা যথাসম্ভব বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষক এবং অভিভাবকগণ তাঁদের অভিমত জ্ঞাপন করলে পরবর্তী সংস্করণে কর্মশিক্ষার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রসঙ্গ আরো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে।

এই পুস্তিকা রচনায় বিশেষভাবে সাহায্য ক'রে আমার পরিশ্রম লাঘব করেছেন অধ্যাপক পাঁচুগোপাল দত্ত। তাঁকে আমার প্রীতি জানাই। বন্ধুবর ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস আমায় নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে উপকৃত করেছেন। তাঁকে আমার শুভেচ্ছা জানাই। স্নেহাস্পদ অধ্যাপক মহান্ চক্রবর্তী এবং পর্ষদের সহকর্মীদের মধ্যে বিশেষভাবে শ্রীঅনিলচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীসুনীলচন্দ্র রায়,

অধ্যাপক শান্তিরাম চট্টোপাধ্যায় আমাকে অনুক্ষণ উৎসাহ জুগিয়েছেন। পর্ষদের কর্মী শ্রীমতী লীনা রায় পাণ্ডুলিপি তৈরীর কাজে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। এঁদের সকলকে আমার ধন্যবাদ জানাই।

শুধু পরীক্ষা-গ্রহণের যন্ত্রস্বরূপ না হয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনায়, কাজে-কর্মে পর্ষৎ সুযোগ্য নেতৃত্ব দিন, দেশবাসীর এই কামনা। আকারে ক্ষুদ্র হলেও পুস্তিকাখানি শিক্ষক-অভিভাবক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

১৫ই অগষ্ট, ১৯৭৪
৭৭।২, পার্ক ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১৬

সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

মুখবন্ধ

অনেকের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগে রবীন্দ্রনাথের কেন তথাকথিত 'লেখাপড়া' হয় নি। শৈশবে এই প্রশ্ন আমার মনেও জেগেছে। অভিভাবক এবং শিক্ষক মশাইদের কাছে উত্তরও পেয়েছি। উত্তর, রবীন্দ্রনাথের মতো এত বড় প্রতিভা শ্রেণীকক্ষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। এইরূপ ব্যাখ্যা আপাতগ্রাহ্য হলেও মনে হয় অতিসরলীকরণদোষে দুষ্ট। পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ যে ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিলেন তাতে স্পষ্টই বোঝা যায়, তিনি বিশ্বাস করতেন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সাধারণ ছাত্রদের পক্ষেও উপযোগী নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং বক্তৃতায় যে ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা চেয়েছেন এবং নিজে ব্রহ্মচর্য আশ্রম ও শ্রীনিকেতনে যে শিক্ষা প্রবর্তন করেছিলেন তা ছিল প্রথমতঃ জীবনমুখী এবং দ্বিতীয়তঃ কর্মমুখী। তাঁর ভাষায় শিক্ষার্থীদের প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নয় কাজের সম্বন্ধও পাতাতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ যে পাঠক্রম ১৯৭৪ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে প্রবর্তন করেছেন তাতে ওয়ার্ক এডুকেশন বা কর্মশিক্ষা একটি অবশ্য পাঠ্য বিষয়। পরীক্ষার জন্য সমস্ত বিষয় মিলিয়ে মোট এক হাজার নম্বরের মধ্যে পঞ্চাশ নম্বরের একটি বিষয় আপাতদৃষ্টিতে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে না হতে পারে। কিন্তু পাঠক্রম প্রণেতাদের ধারণা কর্মশিক্ষা শুধু একটি বিষয় (Subject) নয়, সমস্ত বিষয়ের দিগন্তকে উন্মুক্ত করারও একটি উপায়। পঠনপাঠনের আদর্শ এরকম হবে যাতে শিক্ষা, পুঁথি ও শ্রেণীকক্ষের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে

সম্পর্কিত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন—"প্রথম থেকেই আমার সংকল্প ছিল আশ্রমের ছেলেরা চারদিকের অব্যবহিত-সম্পর্ক-লাভে উৎসুক হয়ে থাকবে; সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে, সংগ্রহ করবে। এখানে এমন সকল শিক্ষক সমবেত হবেন যাঁদের দৃষ্টি বইয়ের সীমানা পেরিয়ে; যাঁরা চক্ষুষ্মান্, যাঁরা সন্ধানী, যাঁরা বিশ্বকুতূহলী, যাঁদের আনন্দ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে।" সুখের বিষয় পর্ষৎ কর্মশিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদ্দের কাছ থেকে যে কৌতূহল লক্ষ্য করেছেন তাতে মনে হয় মধ্যশিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই কর্মশিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সজাগ। এই বিষয়ে একটি সহায়ক পুস্তিকা (Guide Book) লেখা সম্পূর্ণ হয়েছে; আশা করা যাচ্ছে কিছু দিনের মধ্যে তা প্রকাশিত হবে। বর্তমান পুস্তিকাটি সেই Guide Book-এর অগ্রসূচনা বলা যায়। পাঠক্রম চালু হওয়ার অল্প পরেই পর্ষৎ থেকে আর একটি পুস্তিকা Work Education—Suggestions for Implementation প্রকাশ করা হয়েছিল তাতে কর্মশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য এবং বাস্তব রূপায়ণের উপায় সম্বন্ধে আভাস দেওয়া হয়েছে।

এইখানে বলে রাখা প্রয়োজন, কর্মশিক্ষা পাঠক্রমে নতুন সংযোজন হলেও সৌভাগ্যক্রমে পশ্চিমবঙ্গে একাধিক বিদ্যালয় আছে যেখানে এই বিষয়টি মোটেই নতুন নয়। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পরে সমগ্র বাংলার বিভিন্ন স্থানে যেসব জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল সেগুলিতে বিভিন্ন বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বুনিয়াদি বিদ্যালয়গুলিতে তো কর্মমাধ্যম শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টাই হয়েছিল। এই সব ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়গুলিতে কর্মশিক্ষা নতুন তো নয়ই, বরং তাদের অনেকদিনের দাবীর স্বীকৃতি বলা যেতে পারে। আমরা অনেক শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি বর্তমান চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁদের ভাবনার কোন বিরোধ নেই। তাঁরা বিশ্বাস করেন কর্ম-অভিজ্ঞতা পুঁথির তত্ত্বকে প্রাঞ্জল করে এবং শিক্ষান্তে শিক্ষার্থীকে জীবনের বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহায্য করে। তাঁরাও চান ছেলেদের বিদ্যা, যা রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

পাশকরা হবে না, হবে আপনকরা। সুতরাং ক্ষেত্র প্রস্তুত, এখন একমাত্র প্রয়োজন অনেকদিনের মানসিক জড়তা কাটিয়ে উঠে কাজে নামা।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের দক্ষ নেতৃত্বে এই রাজ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার রূপান্তর হতে চলেছে। তাঁর পরিচালনায় এবং পাঠ্যসূচি সমিতি, উপসমিতি এবং বিভিন্ন বিষয়ে খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় পর্ষৎ গত বৎসর নতুন পাঠ্যসূচি প্রস্তুত করেছিলেন। সেবাগ্রামে গান্ধীজির সান্নিধ্যে 'নঈ তালিম' অনুশীলন এবং গঠনমূলক কাজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় 'কর্মশিক্ষা' রূপায়ণে অগ্রণী হয়েছেন। সুতরাং আরম্ভ শুভ হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। লেখকের রচনাশৈলী সম্পূর্ণ নিজস্ব। যাঁরা তাঁর স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা এই স্বল্পপরিসর পুস্তিকাতে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন দেখতে পাবেন।

পরিশেষে পর্ষদের পক্ষ থেকে আমি বিশেষ ভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত আবেদন জানাবো। নাটকের সাফল্য যেমন নির্ভর করে অভিনেতা এবং কলাকুশলীদের উপর তেমনি পাঠ্যসূচির সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সযত্ন প্রয়াসের উপর। যেসব বিদ্যালয় এখনও কর্মশিক্ষা প্রকল্প সম্বন্ধে নিরুৎসাহ আছে সেখানকার শিক্ষকবৃন্দ ও প্রধানদের কাছে সবিনয় অনুরোধ, তাঁরা যেন অবিলম্বে পাঠ্যসূচি অনুযায়ী তাঁদের উপযোগী প্রকল্প গ্রহণ ক'রে কর্মশিক্ষাকে গতিশীল করেন। বাস্তবক্ষেত্রে বাধা নিরসন কিংবা সমস্যা সমাধানের জন্য সাহায্য করতে পর্ষৎ প্রস্তুত থাকবে।

১৫ই অগষ্ট, ১৯৭৪
কলিকাতা

অনিলচন্দ্র বিশ্বাস
সচিব
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

॥ সূচীপত্র ॥

কর্মশিক্ষা

সূচনা

ওয়ার্ক এডুকেশন বা কর্মশিক্ষা কথাটি নতুন। ১৯৭৪ সাল থেকে দশ ক্লাশের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য যে নতুন পাঠক্রম চালু হয়েছে তাতে সমাজসেবা ও শরীরশিক্ষার সঙ্গে কর্মশিক্ষাও স্থান পেয়েছে। এগুলিও যে লেখাপড়ার অঙ্গ সেকথা আমরা প্রায় ভুলেছিলাম ; তাই বোধহয় এগুলি এতদিন যথার্থ গুরুত্ব পায়নি পরীক্ষা-সর্বস্ব শিক্ষা ব্যবস্থায়। চলতি কথায় বা প্রচলিত অর্থে শিক্ষা মানে লেখাপড়া, যাকে বলা যায় শুধু লেখা এবং পড়া, অর্থাৎ বই আর নোট-নির্ভর লিখিত পরীক্ষায় পাশ করা। বিলম্বে হলেও এখন অনেকেই মেনে নিচ্ছেন, এতে চলবে না। স্কুল-কলেজের যা অবস্থা, পঠন-পাঠনে এবং পরীক্ষা গ্রহণে যা বিপর্যয়, পরীক্ষায় সাফল্য অন্তে জীবনযাত্রায় যে বিফলতা, তা বিবেচনা ক'রে মানুষ আজ মর্মে মর্মে অনুভব করছে যে, লেখাপড়াকে জীবনমুখী করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এক সময় আমাদেরই দেশে শিক্ষা এবং জীবনদর্শন একাঙ্গ ছিল। শিক্ষা অর্থে সেদিন শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই ছিল না, কর্ম এবং আচরণ চিহ্নিত করত সত্যিকার শিক্ষিত বা মার্জিত-বুদ্ধি মানুষকে। জীবন এবং আচরণ দিয়ে গড়া শিক্ষার সেই আদর্শ কালক্রমে লুপ্ত হয়েছে। পরাধীনতাই হয়ত এর জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী। সে ইতিহাস আজ আর তুলে ধ'রে লাভ নেই। আবার

নৈরাশ্যের ধ্বনি তুলে অযথা বিলাপ ক'রেও [কাজ] নেই। অগ্রসর আমাদের হতেই হবে। শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধন করতে হবে নতুন মূল্যবোধের আলোকে। সে সুযোগও আজ উপস্থিত। কেননা, এক দিকে বর্তমানের ব্যর্থতা যেমন অনেকখানি মোহমুক্তি এনেছে, তেমনি বাস্তব বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে সামাজিক রূপান্তর সৃষ্টির উপায় হিসাবে শিক্ষার ভূমিকা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। সুতরাং বলা যায় ক্ষেত্র প্রস্তুত।

শ্রমের কাজ, খেলাধূলা, দেহচর্চা এবং সমাজসেবাকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ক'রে এবং ফাইনাল পরীক্ষায় তার জন্য নম্বর দিয়ে, মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ একটা পরিবর্তনের সূচনা করেছেন। জড়তা কাটতে সময় লাগে, মানসিক প্রস্তুতির জন্য অবকাশ চাই। রুটিনের ছকে-বাঁধা পঠন-পাঠনের গতানুগতিকতা ভাঙতেও সময় লাগবে। তাই আপাততঃ হাজার নম্বরের মধ্যে ঐগুলির জন্য মাত্র একশো নম্বর নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। পূর্ণমান কম হ'লেও এগুলি নগণ্য বা গৌণ নয় ; বরং প্রকৃত শিক্ষার গৌরব এতে বাড়বে। পড়ার বই-এর পাতাগুলি জীবন্ত হয়ে উঠবে এরই মাধ্যমে।

অনেক আগেই এসব কথা বলে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী। তারও আগে বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা। মানুষ গড়ার কাজই যে যথার্থ শিক্ষা, কর্ম-কুশলতাই যে শিক্ষার সাফল্য আনে, একথা বেদ উপনিষদের কাল থেকে ভারতের ঋষিকুলও বারবার উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। কান পেতে সেকথা আমরা শুনিনি অথবা গ্রহণ করতে পারিনি। সেই কারণে আজ সমাজ-জীবন থেকে শিক্ষা অনেক পরিমাণে বিচ্ছিন্ন। শিক্ষা ও জীবনাচরণের মধ্যে ব্যবধানের সেই প্রাচীর ভাঙতে হবে। পাঠ গ্রহণের বস্তুকে প্রত্যক্ষ জীবনের আবেগ, অনুভূতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে ভরে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আজ শুধু ধনী বা মধ্যবিত্ত পরিবার থেকেই আসে না ; সমাজের সর্বস্তরের ছেলেমেয়েরা আজ বিদ্যার্জনে আগ্রহী।

যাদের বাপ-মা দিনান্ত পরিশ্রমে রুজি রোজগার করে, কাজই যাদের জীবন, সেই সব অগণিত ছেলেমেয়েদের এমন উপযোগী শিক্ষা দিতে হবে যা হবে আগের চেয়ে অধিকতর অর্থবহ আর জীবনধর্মী।

পাশ করলেই সকলের চাকরি হচ্ছে না ; অদূর ভবিষ্যতে হবার সম্ভাবনাও কম। তা ছাড়া সকলকে চাকুরিজীবী করে তোলাটাও জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। কিন্তু চাকরি না হলেও, কাজ চাই। তার যোগ্যতা অর্জনের জন্য বিদ্যালয়-জীবনের অমূল্য দিনগুলিকে কাজে লাগানো দরকার। তাই আমাদের কাম্য, লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা কাজেকর্মে আগ্রহী হতে শিখুক, নিজের হাতে কাজ ক'রে শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করুক, সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সমাজসেবার প্রথম পাঠ গ্রহণ করুক, তাদের স্বার্থক্লিষ্ট সংকীর্ণতা কেটে যাক, সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সবার মাঝে চলবার মতো সামাজিক মানসিকতা তারা অর্জন করুক, আর সেই সঙ্গে খেলাধূলা ও দেহচর্চা ক'রে সুস্থ-সবল দেহমনের অধিকারী হোক।

বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে শ্রমের কাজ, শরীরচর্চা ও সমাজসেবার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার অর্থ কিন্তু লেখাপড়াকে অবহেলা করা নয়। বরং ঠিক তার বিপরীত। পড়ার মান বাড়াতে হলে পড়ার বোঝা কমাতে হবে ; ছেলেদের মন থেকে ফেলের আতঙ্ক কাটাতে হবে। রাশিকৃত বই অথবা সুদীর্ঘ সিলেবাস ছেলেদের পণ্ডিত ক'রে তুলতে পারে না। বহন করার মতো ভার না দিলে মানসিক কুব্জতা সৃষ্টি হতে বাধ্য। এটা মনস্তত্ত্বের কথা। ঠিক মতো কাজ, ঠিক মতো উদাহরণ ও সহজ-সরল পঠন-পাঠন বিদ্যার্থীর মনে যে রেখাপাত করে তা স্থায়ী হয় ও সারা জীবনের অনুষঙ্গী হয়ে থাকে। অনেক বেশী পড়িয়ে সমানুপাতিক হারে ফল পাওয়া যায় না ; বরং উল্টো হয়, একথা শিক্ষক মাত্রেই অনুভব করেন। তবু সিলেবাসে এক ছটাক কম্‌তি হলে মনে হয় ভাবগত অশুদ্ধ হবে। কিন্তু সিলেবাস যে একটা রূপরেখা মাত্র, একথা আমরা মনে

রাখি না। স্থান-কাল-পাত্রবিচার করে সুদক্ষ শিক্ষক যে শিক্ষা দান করেন তার জন্য কোন ফরমা-মাফিক ফরমূলা হয় না। তাই শিক্ষার মান উঁচু কি নীচু হবে, তা একান্তভাবে নির্ভর করে মাস্টারমশাইদের ওপর। তাঁরাই ঠিক করবেন কোন্ ছেলেটির পক্ষে কতটা সহনীয়।

হাতের কাজ করলেই যে ছেলে পড়াশুনোয় মাটি হয়ে যাবে, এটি সর্বৈব ভুল ধারণা। কর্মে আনন্দের আস্বাদ পেয়ে তার বুদ্ধিবৃত্তি বরং প্রখর হবে, ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবে, মানসিকতা বিস্তৃতি লাভ করবে। শরীরচর্চার অর্থ সবাইকে 'পালোয়ান' করা নয়। তেমনি সমাজসেবা করতে গিয়ে লেখাপড়ায় শৈথিল্য দেখা দেবে, এ ধারণাও মিথ্যা।

আসলে আমরা চেয়েছি কর্মের অভিমুখে শিক্ষা। শিক্ষণীয় বস্তু বলতে এতদিন যার ওপর জোর দিয়েছি সেটি হল কেতাবী শিক্ষা। তাই স্কুলের বাইরে, বাড়ীতে অথবা সমাজে শিক্ষার্থী যা দেখে, শোনে, অনুভব করে তার ভগ্নাংশ মাত্রও পায় না রুটিনের পড়া আর পরীক্ষার মধ্যে। এই কৃত্রিমতার মূলোচ্ছেদ করতে হবে। তাই কর্ম ও শিক্ষার সমন্বয়ে গড়ে তুলতে হবে কর্মশিক্ষার আসর। যেকোন কায়িক শ্রমমূলক কাজে যে কত শিক্ষণীয় বস্তু আছে তা আজও অনাবিষ্কৃত এবং অবহেলিত। মজুরকে মজুরি দিয়ে সামাজিক ঋণ পরিশোধ করতে চেয়েছি আমরা। কিন্তু চাইনি, চেয়ে দেখিনি তার কর্মকুশলতার মধ্যে কতখানি বিদ্যা, কতখানি মানসিক সৌকর্য লুকিয়ে আছে।

শ্রমের প্রকৃত মর্যাদা দিতে হলে, সামাজিক রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করতে হলে, জীবনের উপযোগী শিক্ষার প্রসার করতে হলে কর্ম এবং পুঁথিগত শিক্ষার ভিন্নতা দূর করতেই হবে কর্মশিক্ষারই সাহায্যে।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ নতুন পাঠক্রমে তারই আভাস দিয়েছেন। অনেক দিনের গতানুগতিকতা এবং অনভ্যাস কাটিয়ে একে বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব আজ প্রতিটি স্কুলের।

কেমন ভাবে সেই দায়িত্ব পালনে সরকার এবং পর্ষৎ সহায়ক হতে পারেন, শিক্ষকসমাজ ও শিক্ষানুরাগীরা কিভাবে অগ্রসর হবেন, তার আভাস দেওয়া হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়সমূহে।

কর্মশিক্ষার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য

নতুন সিলেবাসের রূপরেখা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই পর্ষৎকে বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সমালোচনা ভালই, বিশেষতঃ পরিবর্তনের মুখে। জিজ্ঞাসা যে জেগেছে, এটা সুলক্ষণ। নিজের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ যেখানে জড়িত সেখানে অভিভাবকবৃন্দ স্বাধীন মতামত প্রকাশ ক'রে পর্ষৎকে সহায়তা করবেন, এটাই তো কাম্য। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপব্যাখ্যা ক'রে যাঁরা শিক্ষা-সংস্কারের কাজে অহেতুক বাধা সৃষ্টি করতে চান এবং প্রকারান্তরে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করেন, তাঁদের কথা অবশ্য আলাদা। কিন্তু পরিবর্তিত পাঠক্রমে যেহেতু কর্মশিক্ষা বা ওয়ার্ক এডুকেশন একটি নতুন বিষয়, সেহেতু অনেকের মনে নানাবিধ সংশয় জাগা বা কৌতূহল সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্নও উঠতে পারে। সেগুলির কোনোটি তাত্ত্বিক, কোনোটি-বা ব্যবহারিক।

প্রথমতঃ, কৌতূহল জাগতে পারে, ওয়ার্ক এডুকেশন ব্যাপারটা কি, হঠাৎ সিলেবাসেই-বা এটা আনা হল কেন, এর জন্য নম্বর নির্ধারিত করারই বা উদ্দেশ্য কি ?

এগুলির উত্তরে বলা যায় যে, স্কুলের ছেলেমেয়েদের বই-এর পোকা না বানিয়ে 'কাজের ছেলে', 'কাজের মেয়ে' ক'রে তুলতে হবে। তাই লেখাপড়ার সঙ্গে কাজ করাটাও শেখাতে হবে, কাজের মধ্যে শেখবার যা আছে তা জানতে

হবে। পুঁথি-সর্বস্ব শিক্ষার বদলে কর্মমুখী শিক্ষা চাই। তাই সাধারণ শিক্ষার দশ-ক্লাসের ব্যবস্থায় লেখাপড়ার ধরণ-ধারণ পাল্টাতে হয়েছে। সামাজিক রূপান্তর আনার পথে এটি একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

ওয়ার্ক এডুকেশন 'কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ হল 'কর্মশিক্ষা'। বুঝিয়ে দিতে গেলে বলা যায়ঃ

কর্মশিক্ষার অর্থ হচ্ছে—

(১) কাজ করতে শেখা ;

(২) কাজের মধ্য দিয়ে শেখা ;

(৩) কাজের বিষয়ে জানবার যা আছে তা শেখা।

এই তিনটি অর্থই সমানভাবে প্রযোজ্য। এক কথায় বলা যেতে পারে কর্ম ও শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধনের নাম কর্মশিক্ষা।

শ্রমের কাজ করতে শেখা এবং জানাটাও যে শিক্ষার অঙ্গ, তা শুধু বললেই চলবে না, সিলেবাসে তার স্বীকৃতিও চাই। তাই অতিরিক্ত বিষয়ের ফর্দে ফেলে উপেক্ষা না ক'রে, এটিকে আবশ্যিক করা হয়েছে। চূড়ান্ত পরীক্ষায় সাবজেক্ট বা বিষয় হিসাবে না থাকলে আমরা সাধারণতঃ গুরুত্ব দিই না। সেই কারণে বিষয়টির জন্য নম্বর নির্দিষ্ট হয়েছে। স্কুল বুঝবে, এটি আর অবহেলার বস্তু নয়। গণিত, ভূগোল, ইংরেজি, বাংলা প্রভৃতি আবশ্যিক বিষয়ে নম্বরের যা মূল্য, এরও ঠিক ততখানি মূল্য পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখানোর ক্ষেত্রে।

ওয়ার্ক এডুকেশন দিয়ে দেশের কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হবে, হাতের কাজ শেখার উপযুক্ত ক্ষেত্র যখন ওয়ার্কশপে, তখন স্কুলগুলিকে কারখানা বানিয়ে লাভ কি, হাতের কাজ শিখিয়ে ছেলেমেয়েদের কারিগর বানানোই কি উদ্দেশ্য, এর ফলে লেখাপড়ার কি ক্ষতি হবে না,—এ সব নানাবিধ প্রশ্ন সাধারণ মানুষের

মনকে উৎপীড়িত করতে পারে। এ সম্পর্কে ভুল ধারণার নিরসনকল্পে পর্ষৎ কর্মশিক্ষার অবজেক্‌টিভ বা উদ্দেশ্য বিশদভাবে বিবৃত করেছেন। যেমন,—

(১) বৃহত্তর সমাজ-পরিবেশে কাজের যে জগৎ রয়েছে তার সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া ;

(২) নিজের হাতে কাজ করে শ্রমের মর্যাদা দিতে শেখা ;

(৩) কাজের মধ্যে শেখার জিনিস যেটুকু আছে তাকে বুঝে নেওয়া ;

(৪) উৎপাদনমূলক কাজে অংশ গ্রহণ করে আত্মবিশ্বাস অর্জন করা এবং সমাজের সঙ্গে একাত্ম হাওয়া ;

(৫) সামাজিক চরিত্রগত পরিবর্তনে সাহায্য করা।

এর জন্য স্কুল থেকে কোনো পোষাকী 'ওয়ার্কশপ' গড়ে তোলার দরকার নেই। সমাজে যে আটপৌরে ওয়ার্কশপ বা সত্যিকার কর্মশালা ছড়িয়ে আছে, কায়মনোবাক্যে অর্থাৎ শরীরশ্রম ও মনোবল দিয়ে কথায় ও কাজে তার সদ্ব্যবহার করতে শিখবে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী তাদের স্কুল-জীবনে। একটা অর্থবহ এবং উপযোগী সমাজের বুনিয়াদ তৈরী হবে তাতে। লেখাপড়া শিখিয়ে 'বাবু' বানানোর ফুরিয়ে গেছে। কাজের মানুষ তৈরী করতেই হবে যদি সামাজিক অবক্ষয় রোধ করতে হয়। তাই এই নতুন নীতি গৃহীত হয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে।

ছেলেদের শ্রমের কাজ করিয়ে প্রচলিত অর্থে শ্রমিক বা মজদুর তৈরী করা এর উদ্দেশ্য নয়। তেমনি সকলকে কামার-কুমোর বা তাঁতী-চাযায় পরিণত করার জন্যও কর্মশিক্ষা নয়। খেটে-খাওয়া মানুষ অর্থাৎ শ্রমজীবীদের প্রতি মজ্জাগত নাসিকা-কুঞ্চনের অভ্যাস এবং কায়িক শ্রমের প্রতি বীতরাগ নিশ্চয়ই বন্ধ করতে হবে। কলম-পেষা কাজকে জীবন সর্বস্ব না ক'রে দুয়ের মধ্যে একটা সুস্থ সমন্বয় সাধনই হবে সামাজিক রূপান্তর আনার পথে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা, দৈহিক পরিশ্রম, কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে বর্তমান বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি-বিদ্যার উপযুক্ত প্রয়োগ,—সবেরই প্রয়োজন আছে দেশের সমৃদ্ধি এবং সুখ-সম্ভারের জন্য। কিন্তু তার চাইতেও বেশী প্রয়োজন সামাজিক ন্যায়-নীতি সম্পন্ন মানসিকতা এবং সত্যিকার চরিত্র-গঠন। সেই গঠন-মূলক কাজের ভিত্তি রচনা করবে শিক্ষায় নতুন মূল্যবোধ। যার ফলে তন্তুজীবী আর 'তাঁতী' না হয়ে হবেন বস্ত্র-শিল্পী; কৃষি-কর্মে নিযুক্ত মানুষ আর চাষা থাকবে না, সমাদৃত হবেন কুশলকর্মী অন্নদাতারূপে।

কর্মশিক্ষা ও বেসিক এডুকেশন

মনে হতে পারে কর্মশিক্ষা গান্ধীজীর সেই 'বেসিক এডুকেশন'-এর নব রূপায়ন। সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কাও জাগতে পারে, বুনিয়াদী শিক্ষার যে পরিণতি ঘটেছে নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় তারই কি পুনরাবৃত্তি হবে না ?

আশঙ্কা হয়তো অমূলক নয় ; তবে পুরোনো কথা অনেক সময় নতুন ক'রে বলতে হয়। যুগের প্রয়োজনে অনেক সময় পুরাতনকে নতুন ভাবে ব্যক্ত করতে হয়। বুনিয়াদী শিক্ষার যে মূল-নীতির কথা গান্ধীজী বলেছিলেন, ভারতের পক্ষে তাও নতুন ছিল না। কিন্তু তাঁর বলার মধ্যে নতুনত্ব ছিল। জাতীয় প্রয়োজনে তা নতুন স্বীকৃতিও পেয়েছিল। তবু আপাত দৃষ্টিতে 'বেসিক এডুকেশন' সম্পূর্ণ সফল হয়নি। তার অবশ্য বহু কারণও আছে। অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের মনের দ্বিধা-সংকোচ এবং শিক্ষার রাজ্যে কায়েমী স্বার্থের সংঘাত।

তবে সত্যের বীজ নিষ্ফলে যায় না। বিলম্বিত হলেও তা অঙ্কুরিত হয় নতুন ভাব-সিঞ্চনে। আজ work-oriented education বা কর্মমুখী শিক্ষার গুণগত শ্রেষ্ঠত্ব সারা পৃথিবী মেনে নিয়েছে। প্রগতিশীল দেশসমূহে এটি অনেকাংশে চালু হয়েছে এবং হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে কোঠারী কমিশনের রিপোর্ট উল্লেখযোগ্য।

সুতরাং ফল ফলেছে নিশ্চয়ই। আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে চরখা, সাফাই প্রভৃতি আপাত দৃষ্টিতে তেমন রেখাপাত করতে পারেনি। সে

দোষ কিন্তু কুটিরশিল্পের নয়, বা সাফাই নামক স্বাবলম্বী উদ্যোগেরও নয়। তর্কের খাতিরে সামাজিক বিপ্লব চাইলেও সামান্যতম স্বার্থের আঘাত মেনে নিতে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ তখন প্রস্তুত ছিল না। তাই স্বাভাবিক কারণে পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে 'নঈ তালিম' সমান প্রতিযোগিতার সুযোগ পায়নি। 'ভদ্রলোক'দের জন্য 'ভাল ইস্কুল' আর 'ইতর জনের' জন্য 'বুনিয়াদী-স্কুল' এই বৈষম্যমূলক ধারণা তাঁদেরই সৃষ্টি, যাঁরা আগে থেকেই সামাজিক রূপান্তর সম্বন্ধে ছিলেন আতঙ্কগ্রস্ত।

তবে সুখের কথা, দিন পাল্টাচ্ছে,—আমরাও ঠেকে শিখছি। সুতরাং নতুন সিলেবাসে কর্মশিক্ষার মূল নীতি আজ আর আরোপিত বস্তু নয়; এর নতুনতর স্বীকৃতি সামাজিক মূল্যবোধের ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সূচিত হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থাকে চূড়ান্ত ব্যর্থতার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এবং সর্বোপরি নিজেদের বাঁচার তাগিদে আজ প্রায় সর্বস্তরের মানুষ সোচ্চার। বিফলতার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে স্বার্থ-সন্ধানীরা চেষ্টা করলেও সাধারণ মানুষ আজ জাগ্রত প্রহরীর ভূমিকায় স্বপ্রতিষ্ঠ।

'কাজ করা' বা 'কাজ করতে শেখা'টা,—মনে হতে পারে সাংসারিক জীবনের সঙ্গেই অধিকতর যুক্ত,—রুটিন, সিলেবাস ও পরীক্ষার মধ্যে এগুলির স্থান অবাঞ্ছিত। কিন্তু বাঁধা-ধরা রুটিন আর প্রাচীর-বদ্ধ স্কুলের ধারণাটা পাল্টাতে হবে। শিক্ষাকে জীবনমুখী করতে হলে কাজ এবং লেখাপড়াকে নিকটতর করতে হবে। মাস্টারমশাইরা যখন ছেলেদের লেখাপড়ার অঙ্গ হিসাবে কাজের সমাদর ক'রে বলবেন, 'এতে নম্বর আছে, কৃতিত্ব দেখাতে পারলে এটি হবে পরীক্ষা পাশের সহায়ক', তখন কাজের মর্যাদা অনেকখানি বেড়ে যাবে। কাজ করার জড়তাও কেটে যাবে। কাজের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব আর থাকবে না। তা ছাড়া, সমাজের উৎপাদনমূলক ও উন্নয়নশীল কর্ম-প্রকল্পের সঙ্গে স্কুলের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী দেশগঠনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে সমর্থ

হবেন। এই participation বা অংশগ্রহণ সমাজে নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করবে। মূল্যবোধের এই পরিবর্তন সামাজিক রূপান্তরকেও ত্বরান্বিত করবে। তখন জাতীয় চরিত্র গঠনে শিক্ষার ভূমিকা স্পষ্টতর হয়ে উঠবে।

এখন বিচার্য কর্মশিক্ষায় কোন্‌টি প্রধান,—কর্ম না শিক্ষা ; উৎপাদনের দিকে ঝোঁক দেওয়া, না শুধু শেখার ওপর জোর দেওয়া।

এগুলি অবশ্য তাত্ত্বিক প্রশ্ন। সুতরাং এ সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার থাকা উচিত। কেবল কাজ বা শুধু বুদ্ধিগত চর্চার কোনটাই এককভাবে কর্মশিক্ষা নয়। আবার কর্মযুক্ত শিক্ষাও কর্মশিক্ষা নয়। কর্ম এবং শিক্ষার সমন্বয়ই কর্মশিক্ষা। কর্মের ক্ষেত্র থেকে জ্ঞাতব্য বিষয়ের উপযুক্ত চয়ন হচ্ছে কর্মশিক্ষা। সেই শিক্ষাধারার সাবলীল প্রকাশ যেমন সৃষ্টি করবে জীবনমুখী সাহিত্য, আর তার বিষয়বস্তুর বিচার-বিশ্লেষণ তেমনি গড়ে উঠবে জীবনমুখী বিজ্ঞান।

কোমল মাটির স্নিগ্ধ সোহাগ স্পর্শে যে বীজ অঙ্কুরিত হয় তার এক-একটি কচি মুখ সৃষ্টি ক'রে উদ্ভিদ-জীবন, বা ব্যাপক অর্থে একটি জীবনচক্র। তাকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষার্থী শিখবে মাটির কথা ও তার প্রকৃতি-পরিচয়। জল-আলো-বাতাসের সঙ্গে কেমন ক'রে শিশু উদ্ভিদের মিতালি চলে, বিদ্যার্থী তা থেকে নেবে জীবন-বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ। কৃষিকর্মের হিসাব-নিকাশ তাকে দেবে পাটীগণিতের ব্যবহারিক জ্ঞান। আর প্রতিদিনের ক্রিয়াকর্মের বিবরণে রচিত হবে এক সজীব সাহিত্য, যা তার সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে থাকবে। বস্তুতঃ সাহিত্য, বিজ্ঞান আর জীবনদর্শনের একটা সহজ সমন্বয় শিশু-মনে অনুপ্রবিষ্ট হবে কর্মশিক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষার এই হচ্ছে সফল প্রয়োগ। প্রতিটি মানুষের মধ্যে যেন বহুমুখী প্রতিভা প্রচ্ছন্ন আছে তার উন্মেষ ও বিকাশ বাস্তবায়িত হবে নতুন শিক্ষাক্রমে।

উৎপাদন প্রয়োজন। সমাজনীতি ও অর্থনীতির বিচারে দেশকে উৎপাদনমুখী হতেই হবে। লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েকে স্কুলে-কলেজে শ্রমকাতর এবং উৎপাদন-বিমুখ ক'রে রেখে জাতীয় লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

শিক্ষার রূপান্তর সেই কারণেই অপরিহার্য। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করাতে হবে হাজার হাজার শিক্ষার্থীদের। শিক্ষার আনন্দ তাতে বাড়বে। উপযোগী মানসিকতাও গড়ে উঠবে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের। তবে মনে রাখতে হবে স্কুলের পর্বে মুখ্য প্রয়োজন শিক্ষার। উৎপাদন এক্ষেত্রে অনেকটা যেন উপজাত বস্তু (by-product)। সুতরাং কর্মশিক্ষায় কর্ম যেমন উপেক্ষার বস্তু নয়, তেমনি আবার তাকে একান্ত উৎপাদনমুখী ক'রে তোলাটাও বাঞ্ছনীয় নয়। দুয়ের মধ্যে balance বা সমতা আনাই হবে যথার্থ কর্মশিক্ষা। কেননা, কর্মশিক্ষায় শিক্ষাই লক্ষ্য, আর কর্ম হলো তার অনিবার্য উপলক্ষ।

সিলেবাসে কর্মশিক্ষা

সিলেবাস ও পরীক্ষার সঙ্গে কর্মশিক্ষার অন্তর্ভুক্তির অন্যতম উদ্দেশ্য হল শ্রম-কর্মের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। উচ্চ মাধ্যমিকে কর্মশিক্ষামূলক পাঠ্যবস্তু যথা, কোর সাবজেক্ট্‌ ফাইনাল পরীক্ষাভুক্ত না হওয়ায় অতীতে খুবই অনাদৃত হয়েছে। এই ফাঁকি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। তাই পর্ষৎ কর্মশিক্ষাকে আবশ্যিক-ভাবে সিলেবাস-বদ্ধ করেছেন।

কী কী বিষয়ে কতটা পড়তে হবে তার আভাস দেওয়া হয় যাতে, তারই নাম সিলেবাস। সুতরাং কর্মশিক্ষারও একটা সুনির্দিষ্ট সিলেবাস দরকার। কী ধরনের কাজ কতটা করতে হবে তার একটা সীমারেখা সম্পর্কে ধারণা সিলেবাসে থাকা উচিত। অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের ওপর কঠোর শ্রমের ভার চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে কি না, তাও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হওয়া প্রয়োজন।

কাজের নামে ভয় পাওয়ার হেতু নেই। বয়সের অনুপাতে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের দেহ-মনের অনুপযুক্ত কোন কাজই সিলেবাসভুক্ত হয়নি। তাই কঠিন শ্রমের প্রশ্নই ওঠে না। তবে কঠিন কথাটি আপেক্ষিক। একজনের কাছে যে কাজ কঠিন, অন্যের কাছে তা নাও হতে পারে। ছেলেদের ও মেয়েদের কাজের মধ্যেও কিছুটা পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। কাজে অনভ্যাস এবং অপরিচিতির জন্য অন্ততঃ প্রথম দিকে গ্রাম ও শহরের ছেলেদের কাজের তারতম্য থাকতে পারে। কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায় না, যদি মূল উদ্দেশ্য ঠিক থাকে।

পর্ষৎ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকায় [Work Education—Suggestions for Implementation] মূল উদ্দেশ্যটি বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বলা হয়েছে Exposure Stage অর্থাৎ যে সময়ে ছেলেমেয়েরা কাজকে শিক্ষার অঙ্গ ব'লে জানতে শিখবে। স্কুলে, ঘরে, বাইরে, সর্বত্র কাজ ছড়ানো রয়েছে। সেই কাজের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিতে সাহায্য করবেন শিক্ষকবৃন্দ। Attitude develop করা,—যাকে বলে প্রবণতা সৃষ্টি করা এবং ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল কাজের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগানোই হবে এই প্রাথমিক স্তরের কর্মশিক্ষার প্রধান পাঠ। এখানে পাঠ বলতে শুধু পড়া নয়, পাঠ-গ্রহণ বা শিক্ষা নেওয়াই বোঝায়।

এই তিন ক্লাসের ছেলেমেয়েরা নিজের হাতে কোনো কাজ করবে না, তা নয়। বরং অনেকের অনুমান, এই বয়সের স্বভাব-চঞ্চল ছেলেমেয়েরা বেশী করেই কাজ করতে চাইবে। তবে এই Stage-এ কোনো 'imposition' থাকবে না, অর্থাৎ জোর করে কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হবে না। তাতে আগ্রহ বাড়বে, বই কমবে না। বস্তুতঃ, নবম এবং দশম শ্রেণীতে তাদের আবশ্যিকভাবে যে উৎপাদনমূলক কর্মপ্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে হবে, তার প্রস্তুতি-পর্ব হচ্ছে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। উপরের ক্লাসের বড় ছেলেদের কাজে জোগান দেওয়া এবং তাদের নানাভাবে সাহায্য করাটাও নীচু ক্লাসের ছেলেদের অন্যতম কাজ বলে গণ্য হবে।

শিক্ষা গ্রহণের বা তালিম নেবার এই সহজ এবং স্বাভাবিক রীতিনীতি (technique) একদা প্রচলিত ছিল আমাদের দেশে, যখন জীবনযাত্রা আর স্কুলের মধ্যে পার্থক্যের কোন প্রাচীর ছিল না। যে non-formal education-এর কথা আজ দেশে দেশে নতুন স্বীকৃতি পাচ্ছে, তা একদিন দৃঢ়মূল ছিল ভারতীয় শিক্ষানীতিতে। পুঁথিগত বিদ্যার চাইতে সেখানে কর্মানুগ

শিক্ষার সমাদর ছিল বেশী; 'বিজানীয়াৎ' অপেক্ষা 'সমাচরেৎ' এই অনুজ্ঞাই ছিল প্রধান।

বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার যুগে ছেলেমেয়েদের পক্ষে পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ কাজে হাতে-খড়ি নেওয়াটা আরও বেশী প্রয়োজন, আরও বেশী অর্থবহ। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কর্মবিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও সমস্যা সমাধানে নৈপুণ্য অর্জন জীবনমুখী শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য। তাই কর্মশিক্ষা এক অর্থে কর্মবিজ্ঞান, যার যথাযথ অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন ব্যবহারিক জীবনকে বিজ্ঞানসম্মত করে তোলার জন্য।

কর্মশিক্ষার আয়োজনে কর্ম মানে এলোমেলো বা পরিকল্পনাবিহীন কাজ নয়। যে কাজ করলে শিক্ষার্থী একদিকে কর্মকুশল আর অন্যদিকে শাণিত-বুদ্ধি হবে, সেই কাজই প্রকৃতপক্ষে কর্মশিক্ষার মূল উপাদান। প্রত্যেক স্কুলকে সেইভাবে বেছে নিতে হবে ক্লাসের উপযোগী কাজকর্ম।

বলা নিষ্প্রয়োজন, কাজের একই ফরমুলা সকল স্কুলে সমানভাবে প্রযুক্ত হতে পারে না। স্থান, কাল এবং পরিবেশ অনুযায়ী বিদ্যালয় ভেদে কর্মপ্রকল্প হবে বিভিন্ন। পর্ষৎ কর্মশিক্ষার যে সিলেবাস রচনা করেছেন তাতে তাই নানাবিধ কাজের উল্লেখ আছে। তবে সেই তালিকাই শেষ তালিকা নয়। অবস্থাবিশেষে কর্মপ্রকল্পের হেরফের হতে পারে। তালিকায় সংযোজনও করা যাবে পর্ষদের অনুমোদন সাপেক্ষে।

পর্ষৎ-প্রকাশিত তালিকায় শহর ও গ্রামাঞ্চলের জন্য স্বতন্ত্র কর্ম-প্রকল্পের উল্লেখ থাকলেও যেকোনো প্রকল্প শহরের বা গ্রামের স্কুলে গ্রহণ করা যেতে পারে। পরিবেশ উপযুক্ত হলে বা সহায়-সম্পদের দিক থেকে বাধা না এলে প্রকল্প নির্বাচনে বৈষম্য না থাকাই উচিত।

ওয়ার্ক প্রজেক্ট বা কর্মপ্রকল্প নির্বাচন করার সময় সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, যা কিছু কাজ-কর্ম তা মানুষের পাঁচটি মৌলিক প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে। যেমন —

(১) খাদ্য (food),

(২) বস্ত্র (cloth),

(৩) আশ্রয় (shelter),

(৪) সমাজ (society)

(৫) সংস্কৃতি (culture)।

—এর এক-একটি নিয়ে যেসকল activity চলে তা নিঃসন্দেহে work-centric বা কর্মকেন্দ্রিক। সেই কর্ম-পঞ্চকের সঙ্গে পরিচয় এবং অংশগ্রহণের প্রথম পাঠ নেবে প্রতিটি শিক্ষার্থী দশ ক্লাসের সাধারণ শিক্ষায়। তবেই শিক্ষা হবে জীবনমুখী এবং বাস্তবধর্মী।

কর্মশিক্ষার রূপায়ণ : গ্রামে ও শহরে

নীতির দিক দিয়ে কর্মশিক্ষা গ্রহণযোগ্য হলেও প্রশ্ন হতে পারে, কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগ কেমন ভাবে সম্ভব, বিশেষ ক'রে যেখানে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েরা জড়িত।

বাস্তব রূপায়ণের জন্যই তো সিলেবাস। এতদিন শুধু আমরা আকাশ-কুসুম ভেবেছি। কিন্তু আবশ্যিক প্রয়োগের কথা তেমন ভাবে চিন্তা করিনি। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে, বিশেষ ক'রে আবাসিক স্কুলগুলিতে, সুশৃঙ্খলভাবে এই ধরনের কাজ-কর্ম হয়তো হয়। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থায় এর সম্যক স্বীকৃতি ছিল না। তাই এতদিন ছেলেমেয়েরা আচার-আচরণে কাজে-কর্মে যতই দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাক না কেন, পরীক্ষার খাতায় লিখিত বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাতে না পারায় তাদের পাশের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। কৃত্রিম ফেলের কলঙ্ক নিয়ে কত যে কুসুম-কলি অনাদরে অকালে ঝরে গেছে তার হিসেব নেই। এই অপচয় রোধ করার উদ্দেশ্যেই সিলেবাসে কর্মশিক্ষার সংযোজন।

বিজ্ঞানশিক্ষায় ল্যাবোরেটরীতে কোনো experiment করার আগে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক কাজে (elementary practice) অভ্যস্ত হতে শেখে। তেমনি নবম ও দশম শ্রেণীতে উৎপাদনমূলক কাজে যুক্ত হবার আগে, নীচের ক্লাসেই ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের প্রাথমিক কাজে দক্ষ হয়ে নেবে। সেই কারণে মধ্যশিক্ষার সিলেবাসে কর্মশিক্ষা দুই পর্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

বই এবং রুটিনের বোঝা কিছুটা কমলে, পরীক্ষার আতঙ্ক কাটলে, হাসিমুখে ছেলেমেয়েরা কাজে ব্রতী হবে। লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে কর্মমুখী করার কাজটি আকারে বড় বলে মনে হলেও আসলে শক্ত নয়। অফুরন্ত কাজ ছড়িয়ে আছে শহরে, গ্রামে, গঞ্জে। দু-হাত বাড়িয়ে তার সামিল হওয়াটাই বড় কথা। একবার আয়াস-বিমুখতা কাটলে, বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে সাংগঠনিক মানসিকতা জাগলে, এ কাজ সহজেই করা সম্ভব।

কর্মশিক্ষার আদর্শে উদ্বুদ্ধ এমনি একটি গ্রাম্য স্কুলের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। শহর থেকে দূরে, নদীর তীরে,—গ্রামের একটি স্কুল। গ্রামটি কোলিয়ারী অঞ্চলের সীমানা ঘেঁষে। চাষী-প্রধান গ্রাম হলেও কুটির-শিল্পীর অভাব নেই। তাঁতী আছে অনেক ঘর। কামার, কুমোর, ছুতোর মিস্ত্রিও কম নয়। কিন্তু হাতের কাজে পেট ভরে না। তাই গ্রামের ছেলেরা চাকরির দায়ে যায় কাছের কয়লা-খাদে অথবা শহর-বাজারে ছোট-বড় অফিসে। এক কালে এদের সকলেরই উপজীববিকা ছিল চাষ। একটা স্বয়ং-সম্পূর্ণতার ছবি। কিন্তু সে প্রাচুর্য আর নেই। আজ তাই সেখানে নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং গরীবই বেশী। এই গরীব গ্রামবাসীরাই গড়ে তুলেছে একটি দশ-ক্লাসের স্কুল, যেটি আগে ছিল সিনিয়র বেসিক। মাস্টারমশাইদের প্রায় সবাই গ্রামেই থাকেন। পাল-পার্বণে তাঁরা আর পাঁচটা গ্রামবাসীকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দ-উৎসব করেন, পরস্পরের সুখ-দুঃখের ভাগীদারও হন। স্বল্প আয় হলেও তাঁরা কোন মতে চালিয়ে নেন। এ হেন স্কুলে ছাত্র-সংখ্যা হবে প্রায় তিন-শো। ছেলেরা সময়মত মাইনে দিতে পারে না,—কিছুটা অভাবে, কিছুটা বা স্বভাবে। ছাত্রদের মধ্যে অনেককেই রুজি-রোজগারের কাজে বাপ-মাকে সাহায্য করতে হয়। এরা দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত থাকে স্কুল ঘরে। এদের টিফিন খাবার পয়সা নেই।

গ্রাম-বাংলার অগণিত স্কুলের চেহারাই এই রকম। মিল আছে বেশী, অমিল কম। গ্রামের মানুষের কাছে স্কুল একটি সম্পদ, কেন না বাইরের জগতে

যাবার এটিই একমাত্র সদর দরজা। স্কুলের পরিচালনে, দলাদলি থাকলেও দরদের অভাব নেই। তাই সংঘর্ষ হয়তো হয়, কিন্তু তার আঘাত লাগে না বিদ্যালয়ে। বাইরের শত্রু এলে গ্রামবাসী রুখে দাঁড়ায় স্কুলটিকে রক্ষা করতে। তখন স্কুল আর গ্রাম এক।

নতুন সিলেবাসে লেখাপড়ার সঙ্গে কাজকর্মকে প্রায় সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে,—এই সংবাদ এসে পৌঁছলো গ্রামের স্কুলটিতে। গ্রামের কেউ কেউ, বিশেষ করে স্কুলের ভাল-মন্দে জড়িয়ে থাকেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অনেকেই কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। তাহলে এখন কি হবে? নতুন ধরনের লেখাপড়ায় ছেলেদের ভাল হবে তো? মাস্টারমশাইদের মধ্যে দু-চার জন, স্কুলের প্রথম ইটখানি গাঁথার সময় থেকে আছেন। গ্রাম এবং স্কুলের মধ্যে যোগাযোগের তাঁরাই হচ্ছেন সেতু। স্কুলের সব কাজে তাঁরাই এগিয়ে আসেন। এঁরা বললেন, "বেশ তো, একদিন সবাইকে নিয়ে মিটিং ডাকুন, ব্যাপারটা কী তা বুঝে নিতে হবে।" গ্রামবাসীদের মিটিং হল। কমিটির মেম্বার, প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য মাস্টারমশাই থেকে শুরু করে তাঁতী পাড়া, বামুন পাড়া ও পাশের গ্রামের বয়স্ক হিতৈষীরা সবাই মিলে সভা করলেন স্কুলটিকে নতুন সাজে সাজাতে।

স্থির হল, এ সুযোগ ছাড়া হবে না। গভর্ণমেন্ট, বোর্ড যখন এগিয়ে এসেছেন, আমরাও পিছিয়ে থাকবো না। ছেলেগুলোকে শুধু 'বাবু' বানিয়ে কাজ নেই। ঘরের ছেলে ঘরের কাজে, রোজগারের কাজে পাকা-পোক্ত হোক এই শিক্ষার ভেতর দিয়ে।

মাস্টারমশাইরা বললেন, কাজ শেখানোর ভার আপনারা নেবেন তো?

গ্রামের বৃদ্ধ তাঁতী, প্রৌঢ় চাষী, সকলের চোখেই তখন আনন্দের ধারা। তাঁরা বলে উঠলেন, নিশ্চয়ই মাস্টার, নিশ্চয়ই। এতদিন শুধু তোমরাই ছিলে মাস্টার, এখন থেকে আমরাও মাস্টার! শেখাবো বৈ কি? হাতে-কলমে জীবনভোর আমরাও তো শিখেছি এমনিভাবে বাপ-ঠাকুর্দার কাছ থেকে।

মাস্টারমশাইরা প্রশ্ন তুললেন, 'কি কি কাজ নেওয়া হবে, বলুন তো ?'

উত্তরে গ্রামবাসীরা বললেন, 'মোটা কাজ নিন,—যেমন চাষ আর তাঁত। চাষ দেয় অন্ন, তাঁত দেয় বস্ত্র। অন্য কাজ আপনা থেকেই আসবে।'

বয়স্কের আশীর্বাদ আর যুবকের উৎসাহ নিয়ে মাস্টারমশাইরা কর্মশিক্ষায় নতুন আদর্শ নতুন অর্থ খুঁজে পেলেন গ্রামের সেই সভায়। বোর্ডকে জানিয়ে দিলেন তাঁরা তাঁদের স্কুলের কর্মপ্রকল্প।

ঠিক হল স্কুলের ছেলেরা নিজেদের হাতে স্কুলের মাঠে তরিতরকারী ও ফলফুলের বাগান তৈরী করবে। তাদের সাহায্য করবে, তাদের শিখিয়ে দেবে গ্রামেরই চাষী। সাজ-সরঞ্জাম কিছু কিছু আগে থেকেই স্কুলে আছে। সিনিয়র বেসিকে এসব থাকারই কথা। আর নতুন যা লাগবে তা সাধ্যমত স্কুল থেকে কিনে দেওয়া হবে যতদিন না সরকারী সাহায্য পাওয়া যায়। তাছাড়া ছেলেরা নিজেদের ঘর থেকেও কিছু জোগাড় করবে। ছোট ছোট খুরপি সস্তায় বানিয়ে দেবে কামার খুড়ো। ছুতোর দাদা বাঁট বানিয়ে দেবে কাঠ দিলে। সেই কাঠও মিলবে গ্রামেরই বন-জঙ্গলে। চাষের জন্য সার সংগ্রহ ক'রে দেবে গ্রামের রাখাল ছেলে সামান্য মজুরির বিনিময়ে। তাছাড়া স্কুলের আমবাগানের এক ধারে কম্পোষ্ট পিট্ তৈরী করবে ছেলেরাই। তা থেকেও সার মিলবে। জলের ব্যবস্থা কিছুটা আছে, আরো কিছু করতে হবে। এ অঞ্চলে টিউব ওয়েল চলে না। তাই একটা বড়, গভীর ইঁদারা চাই। তার জন্য সরকারী সাহায্য আসবে ; তবে স্কুল থেকে তার উদ্যোগ আয়োজন করতে হবে। কেননা স্কুলের সীমানার মধ্যেই এটি হওয়া চাই। তাতে ছেলেদের যেমন পানীয় জল মিলবে, তেমনি মিলবে তাদের সব্জি বাগানে সেচের জল। গ্রামবাসীদের তাতে আপত্তি নেই, বরং উৎসাহ আছে অফুরন্ত।

আরও ঠিক হল, গ্রামের তন্তুজীবিদের যাতে উপকারে আসে এমন কাজও করতে হবে। প্রায় একশো ঘর তাঁতীর বাস এই গ্রামে। তাদের জাতি-বৃত্তি

তাঁত বোনা। মিল-সুতার দাম বেশী, কেনবার মূলধনও তাদের নেই। তাছাড় মিলের সুতোর অভাবও নিদারুণ। বছরে মাত্র দু-তিন মাসের চাহিদা মতো সুতো মেলে। বাকী সময় তাঁত অকেজো থাকে। এ ছাড়া সংগঠনের অভাবে তৈরী কাপড়-গামছা সময়মত বিক্রিও হয় না। অভাবের দিনে তাঁতীদের আধা-কড়িতে কাপড় বেচে দিতে হয়। অথচ এরা উচ্চমানের কাজ করতে পারে স্বচ্ছন্দে। রং-এর কাজও এরা জানে। সরকারের কুটির শিল্প বিভাগ, সমবায় বিভাগ এদের সাহায্য করতে চান। অবশ্য সে ব্যবস্থা কিছুটা হয়েছে; কিন্তু আরও অনেক বাকী। সে কাজে যোগান দেবে স্কুলের কর্মপ্রকল্প,—যাতে ছাত্র-শিক্ষকের ভূমিকা যথেষ্ট।

সভায় মাস্টারমশাই জানালেন, সাবেক আমলের চরকার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন নতুন মডেলের সুতোকাটা কল পাওয়া যাচ্ছে। ঐ কলে একসঙ্গে দু' টেকো থেকে আট টেকো (spindle) দিয়ে আপনা হতেই সুতো কাটা চলে। যন্ত্রের সাহায্যে তূলো থেকে পাঁজ তৈরী হয়। এই হাত-কলটি অতি অল্প আয়াসে চালানো যায়। ছেলেমেয়েরা সহজেই এই কল দিয়ে প্রচুর সুতো তৈরী করতে পারে। এর থেকে অবসর সময়ে কাজ ক'রে মাসে ৫০।৬০ টাকা আয় হতে পারে।

ছাত্রদের ব্যবহারের উপযোগী এই ধরনের দুই টাকু যুক্ত সুতোকাটা কলের দাম প্রায় দুশো টাকা। সরকার ও খাদি কমিশন ছাত্রদের জন্য এই ধরনের কল-কেনার ব্যাপারে অর্থ সাহায্য দিতে প্রস্তুত।

মাস্টারমশায়ের এই আশ্বাসে সকলেই সোৎসাহে বললেন, আমাদের স্কুলের জন্য এই কল অবশ্যই চাই। একক ভাবে হয়তো এই কল সকলের কেনা সম্ভব নয়। কিন্তু স্কুল থেকে যদি কেনার ব্যবস্থা হয় তাহলে একদিকে যেমন ছেলেদের শেখার সুবিধে হবে, অন্য দিকে তেমনি গ্রামবাসীর উপকারে আসবে।

সভায় গ্রামবাসীদের সম্মতি পেয়ে মাস্টারমশাইরা বসলেন কিভাবে কি করা যায় তার প্ল্যান করতে। নবম শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা চল্লিশ। ঠিক করলেন তাঁরা এই ছেলেদের প্রথমে দু'দলে ভাগ করা হবে। এক দল প্রথম বৎসর যুক্ত হবে কৃষির কাজে, আর অন্য দল হবে বস্ত্র-শিল্পে। এরা যখন দশম শ্রেণীতে পৌঁছবে তখন কৃষির দল যাবে শিল্পে, আর শিল্পের দল আসবে কৃষিতে। ষষ্ঠ শ্রেণীর কৌতূহলী ছেলেরা দেখবে, শুনবে, কাজ করতে চাইলে বড়দের সাহায্যও করবে। তাছাড়া অন্য শ্রেণীর ছেলেরাও যোগ দেবে স্কুলের বিভিন্ন কাজে। স্কুল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, আমবাগানে কম্পোষ্ট সার তৈরী করা, এসব তো আছেই। উৎসবে-অনুষ্ঠানে ছেলেরাই হবে স্বেচ্ছাসেবক। এক বৎসরের মধ্যে তাদের বড় ইদারা তৈরী করতে হবে। কোলিয়ারী থেকে কয়লা সংগ্রহ ক'রে আনা, ইট তৈরীর কাজে সাহায্য করা, এসবেও ছেলেরা হবে অগ্রণী। মাস্টারমশাইরা হবেন লীডার। বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজও স্কুল গ্রহণ করবে। পাড়ায় পাড়ায় এর জন্য সকল রকম ব্যবস্থার ভারও ছেলেদের ওপর। তারাই খোঁজ-খবর নিয়ে স্কুলে জানাবে, আর স্কুলের খবর পৌঁছে দেবে তাঁদের কাছে। এভাবেই রচিত হবে সহযোগিতার ভিত্তি।

গ্রামের স্কুলটি গড়ে উঠেছিল ঠিক এইভাবে। সে ইতিহাস আজও গ্রামবাসীরা ভোলেনি। কতো শ্রম, কতো মমতা দিয়ে গড়া স্কুলের ঘরখানি! তাই বলা যায় কর্মশিক্ষার ভিত্তিভূমি এখানে আপনা হতেই রচিত।

এ তো গেল গ্রামের স্কুলের কথা। এখন শহরের একটি স্কুলের কথায় আসা যাক। বর্ণনাটি গল্প নয়, কল্পনাবিলাসও নয়,—বাস্তব সত্য।

কলকাতায় অভিজাত পরিবেশে মেয়েদের একটি স্কুল। চারতলা পাকা বাড়ী। চমৎকার সাজানো-গোছানো। এগারো ক্লাশের উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুল। ছাত্রী সংখ্যা প্রায় সাড়ে-সাতশো। অন্যান্য ষ্ট্রীমের সঙ্গে হোম সায়েন্সও আছে। সুন্দর একটি হল ঘর, আর তার সঙ্গে আছে একটি কাজের ঘর, যার নাম ওয়ার্ক

শপ। আর আছেন এক দল নিষ্ঠাবতী শিক্ষিকা, যাঁদের আবার নেতৃত্ব দেন একজন কাজপাগল প্রধান শিক্ষয়িত্রী। নতুন সিলেবাস তৈরী হতেই তিনি বার বার আলোচনা করে চলেছেন অনেকের সঙ্গে, কেমন ক'রে সার্থক রূপ দেওয়া যায় কর্মশিক্ষাকে। মেয়েদের উৎসাহে অন্ত নেই। তাদের নাইবা থাকলো খোলা মাঠ, নাইবা থাকলো প্রচুর জমি। সহরের বুকে সীমিত আয়তনের মধ্যেই তো তাদের কাজ করতে হবে। কাজের কি অভাব আছে? এর মধ্যেই সেখানে ছাত্রীরা তাদের হাতে তৈরী সূচীশিল্পের বস্তু-সামগ্রীদিয়ে প্রদর্শনী করেছে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে। মেয়েদের হাতের তৈরী মাটির কাজ, তুলির কাজ, উলের কাজ, সত্যই দেখবার মতো। স্কুলের মধ্যে তারা বানিয়েছে একটি কাজের ঘর, আর তার সঙ্গে গড়ে তুলেছে একটি বিক্রয়-কেন্দ্র। অভিভাবকরা এসে দেখে গিয়েছেন তাঁদের নিজেদের মেয়েদের কাজ, তৃপ্ত হয়েছেন তাদের কর্মকুশলতা দেখে। তারা সাবান তৈরী করতে শিখেছে। স্বল্প আয়োজনে বিচিত্র ধরনের ফুড-প্যাকেট বানাতে শিখেছে। সাজ-সরঞ্জাম পেলে তারা আরও কত কী করতে পারে। এবার তারা মণিপুরী তাঁত বা ফ্রেমলুম দিয়ে স্কার্ফ, তোয়ালে প্রভৃতি বানাবার সংকল্প নিয়েছে। নতুন মডেল চরখা বা সুতোকাটা কল তাদেরও চাই। দুজন শিক্ষিকা এর জন্য ট্রেনিং-ও নিয়েছেন।

ক্লাশের মেয়েদের ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে ভাগ ক'রে এক এক ধরনের কাজ দেবার পরিকল্পনা নিয়েছেন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। নবম শ্রেণীর মেয়েরা ওয়ার্ক প্রজেক্ট হিসাবে নিচ্ছে বস্ত্র শিল্প,—যার মধ্যে আছে রং-সুতোর কাজ, উলের কাজ, বয়ন, ইত্যাদি। হোম সায়েন্স আর ক্রাফট্ টীচিং আগে থেকেই ছিল ব'লে এই স্কুলের মেয়েরা কাজেকর্মে অভ্যস্ত। এখন তারা প্রতিটি কাজের মধ্যে শিক্ষণীয় বস্তু আহরণে ব্রতী হবে। এ কাজের সাহায্য করবেন শিক্ষিকাবৃন্দ। গ্রামের সমাজ বলতে আমরা যা বুঝি তা এখানে নেই সত্য। কিন্তু আছেন একদল সুশিক্ষিত,

সচেতন অভিভাবকবৃন্দ। তাঁদের উৎসাহ আছে, আর আছে স্কুলের জন্য প্রাণভরা দরদ। তাঁদের আদরের মেয়েরা কাজের-মেয়ে হয়ে উঠবে, শ্রম-জীবনের আনন্দ উপভোগ করবে, শিক্ষায় এর চেয়ে বড় সাফল্য আর কি হতে পারে? তাই কর্মশিক্ষা প্রচলনে শহরের এই স্কুলে কোন বাধা তো নেইই, বরং আছে অনুকূল সমাদর।

কর্মশিক্ষায় আপাত সমস্যা

কর্মশিক্ষা প্রবর্তনে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। সব স্কুলে মাস্টার মশাইদের সমান সহযোগিতা নাও মিলতে পারে। আবার এমন স্কুলও থাকতে পারে যেখানে দেখা যাবে আগ্রহের অভাব, স্থানের অকুলান, আর্থিক অনটন ও প্রতিকূল পরিবেশ।

সহযোগিতার তারতম্য থাকতেই পারে। স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সব স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষকবৃন্দ এ কাজে সমান ভাবেহয়তো এগিয়ে আসবেন না। কিন্তু বাধাটা কোথায় তা বুঝতে হবে। প্রয়োজনবোধে তাঁদের বুঝিয়ে অনুপ্রাণিত করতে হবে। নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সময় লাগলেও এ কাজ অসম্ভব নয়। তা ছাড়া সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কর্মশিক্ষাকে ঠিক-মত চালু করার দায়িত্ব স্কুলকে নিতেই হবে। পরিচালক সমিতিরও দায়িত্ব আছে। স্থানাভাব ও অর্থাভাব দূর করতেই হবে। এই ব্যাপারে সরকার এবং পর্ষৎ সমভাবে আগ্রহী। এ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া এবং দেখাশুনা করার জন্য রাজ্য কমিটি এবং জেলা ভিত্তিক কমিটি গঠিত হয়েছে। কোনো স্কুল বা স্কুল সমষ্টি (School complex) কর্মশিক্ষা প্রচলন করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হলে তা জানাতে হবে জেলা কমিটিকে। কমিটি তখন বিচার-বিবেচনা করে যথাসম্ভব সাহায্য করবেন সমস্যা দূরীকরণে। একই ব্লক বা থানাভুক্ত স্কুলগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিনিময় এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে একের অভাব অন্যে পূরণ

করতে পারে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি, কুটিরশিল্প, সমবায় প্রভৃতি বিভাগের কর্মীরাও সরকারী নির্দেশে স্কুলগুলিকে সাহায্য করবেন, তবে, মূলতঃ উদ্যোগী হতে হবে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে। পরিবেশ প্রতিকূল হলে জেলা কমিটির পরামর্শে করার তাকে অনুকূল চেষ্টা করতে হবে। সে ক্ষেত্রে পর্ষদ্‌কেও অবহিত করা প্রয়োজন। স্কুলে লেখাপড়ার কাজে কর্মশিক্ষা হচ্ছে অন্যতম অঙ্গ। তাতে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বাধা এলে সে বাধা দৃঢ়তার সঙ্গে অতিক্রম করতে হবে সমবেত প্রচেষ্টায়। ভূগোল বা গণিত ভাল লাগে না বলে ওগুলি পড়ানোতে বাধা দেওয়া যেমন হাস্যকর, যে কর্মশিক্ষা আজ শিক্ষার অন্যতম মূল উপাদান হিসাবে গৃহীত হয়েছে, মনোমত নয় বলে তার প্রচলনে বিরোধিতা করা ও তেমনি অযৌক্তিক।

নবপ্রবর্তিত এই কর্মশিক্ষা বিষয়ে অনেকেরই অভিজ্ঞতা না থাকতে পারে। তাঁরা কি ভাবে বিষয়টি জানবেন, কি ভাবেইবা শেখাবেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা জাগতে পারে।

প্রশিক্ষণ ছাড়া অগ্রসর হওয়া যাবে না, এই রকম ধারণা অনভ্যাস বশতঃ সৃষ্ট হয়েছে অনেকের মনে। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু কর্মশিক্ষা কোনো জটিল ব্যাপার নয়। প্রশিক্ষণ অথবা সমমুখীকরণ হলে এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা পরিমার্জিত হয় সত্য, কিন্তু তার জন্য কাজের সূত্রপাত বিলম্বিত হবে, এটা কোন যুক্তি হতে পারে না।

কাজ এবং লেখাপড়ার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করা, অথবা কোনো কর্মপ্রকল্প থেকে শিক্ষণীয় বস্তু আহরণ করা, শিক্ষক-সমাজের কাছে কোনো অপরিচিত বা অপরীক্ষিত টেকনিক নয়। বহু সুদক্ষ শিক্ষক আছেন যাঁরা বাস্তব জীবন থেকে উদাহরণ সংগ্রহ ক'রে সেগুলিকে পাঠ্যবস্তুর সঙ্গে সমন্বিত করতে অভ্যস্ত। শিক্ষা-প্রদানের প্রকৃষ্ট প্রণালী হিসাবেই তাঁরা এটিকে গ্রহণ করেছেন তাঁদের

শিক্ষক-জীবনে। শুধু উপযুক্ত স্বীকৃতির অভাবেই তাঁরা এই পদ্ধতি পুরোপুরি-ভাবে কার্যকরী করতে পারতেন না এতদিন। আজ সে বাধা অতিক্রান্ত। সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষক তাঁর স্বকীয় কল্পনা-শক্তির সাহায্যে নিঃসন্দেহে কর্ম ও শিক্ষার সমন্বয় সাধনে সমর্থ হবেন।

তাছাড়া গৃহস্থ বাড়িতে অভিভাবক মাত্রেই অজানিতভাবে প্রতিনিয়ত নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন কর্মশিক্ষা বিষয়ে। সে দিক দিয়ে অভিভাবক মাত্রেই এক অর্থে শিক্ষক। সেই ব্যাপক শিক্ষাভিযানে নানাভাবে সকলেই অংশ গ্রহণ করছেন। বৃত্তি হিসাবে যিনি শিক্ষকতা করছেন, তিনি সেই বিশাল প্রক্রিয়ার প্রতীক মাত্র। কর্মশিক্ষা সেই বিক্রিয়ার (reaction) অনুঘটক catalytic agent। তাই যিনি অভিভাবক, তিনিই শিক্ষক এবং যিনি শিক্ষক, তিনিই অভিভাবক। পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে তাঁরা 'জীবন ব্যাপী শিক্ষা' (Life-long education as a continuing process—unesco Committee) অভিযানের সার্থক সহযাত্রী। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই নতুন মূল্যবোধ পাঠক্রমের একটা আমূল রূপান্তর সূচনা করে। প্রশিক্ষণ বা ট্রেনিং তো জীবনের প্রতি ঘাত-প্রতিঘাতে ঘটে যাচ্ছে। আদর্শ শিক্ষক তিনিই, যিনি এই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সদা সচেতন। কেতাবী ট্রেনিং-এ কতটুকুই-বা কাজ হয়? শুধু থিয়োরীতে কিছুই হবে না, যদি না তার ব্যবহারিক প্রয়োগ হয়। তাই এ ক্ষেত্রে জলে নেমে সাঁতার শিখতে হবে, তীরে দাঁড়িয়ে শুধু হাততালি দিলে চলবে না।

অবশ্য তত্ত্বের দিক থেকে প্রশ্ন হতে পারে রীতিবদ্ধ (formal) প্রশিক্ষণের পরিবর্তে এই ধরনের সহজাত প্রথায় শিক্ষাদান অতিমাত্রায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে যাবে কি না। আর যেখানে শত শত স্কুলের প্রশ্ন জড়িত, সেখানে কর্মশিক্ষার standardisation বা নির্দিষ্ট মানের প্রয়োজন আছে কি না।

প্রয়োজন অবশ্যই আছে। সেই standard বা মান নিরূপণের জন্য চেষ্টাও চলছে। ওপর থেকে চাপানো কৃত্রিম ফরমূলা দেওয়া যে যায় না, তা নয়। তবে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অকৃত্রিম ভাবে যেটা গড়ে ওঠে, তার মূল্য ও কার্যকারিতা অনেক বেশী। প্রথম দিকে এই কাজে subjective element বা ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের প্রভাব কিছুটা থাকতে পারে। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। আগামী ১৯৭৬ সালে যখন কর্মশিক্ষা বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হবে, তার আগেই একটা সমীক্ষার ভিত্তিতে স্থিরীকৃত হয়ে যাবে কোথায় কতখানি কর্মশিক্ষার প্রসার হয়েছে।

পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষাদান এখনও বহুলাংশে পরীক্ষা-নির্ভর। পরীক্ষার গুরুত্ব নিশ্চয়ই আছে এবং থাকবে। কিন্তু শুধু প্রশ্নপত্রের ধরণ-ধারণের দিকে তাকিয়ে যদি পঠন-পাঠন সম্পূর্ণভাবে নিরূপিত হয় তাহলে যেন-তেন প্রকারেণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াটাই বড় কথা হয়ে দাঁড়াবে। তাতে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে বাধ্য।

কাজ করতে শেখা, কাজের মধ্য দিয়ে শেখা যেখানে কর্মশিক্ষার বড় কথা, সেখানে শিক্ষণ কিছুটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলে ক্ষতি নেই। বৈচিত্র্য সকল সময়ে বর্জনীয় নয়। বরং সেই বৈচিত্র্যের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে কলা-কৌশলের মৌলিকত্ব। টেকনিকের উন্নতি বিধানের দিক দিয়ে এর প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি।

কর্মশিক্ষার মূল্যায়ন

প্রশ্ন হতে পারে এক-এক স্কুলে এক-এক ধারায় কাজ শেখানো হলে এবং বিভিন্ন স্কুলে নানা রকমের কাজ হলে, ফাইন্যাল পরীক্ষায় মার্ক দেওয়াটা এলোমেলো হওয়া সম্ভব। তার উত্তরে বলা যায়, বাইরের পরীক্ষক (External Examiner), প্রধান পরীক্ষক ও নীতি-নিয়ামক বোর্ড ঠিক করবেন কি ভাবে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমতা বজায় থাকে। পর্ষৎ এজন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে অনুশীলনের কাজ শুরু করছেন। এই কারণেই স্কুলে গৃহীত প্রজেক্টগুলি পর্ষৎ-এর পূর্ব-অনুমোদন সাপেক্ষ। এই অনুমোদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্পগুলির আপেক্ষিক মান আগে থেকেই নির্ধারণ করা। তার ভিত্তিতে কাজের পরিমাপ সম্বন্ধে যথা-প্রয়োজন নির্দেশ দেওয়া হবে। পর্ষৎ এজন্য একটি সেল তৈরী করেছেন। সেলের কাজ হবে ক্রমাগত অনুশীলন করে যাওয়া এবং ফলাফল জানিয়ে দেওয়া।

তাছাড়া জেলাভিত্তিক কমিটি গঠিত হয়েছে স্কুলগুলিকে প্রকল্প রচনায় সাহায্য করার জন্য। তাদের কাজের তদারকি করার ভারও ঐ কমিটির ওপর ন্যস্ত। প্রত্যেক জেলা কমিটিতে সরকারের উন্নয়ন বিভাগসমূহের কর্মিবৃন্দ ও পর্ষৎ-এর প্রতিনিধিরা থাকবেন। ঐসব কমিটি প্রতিটি school complex বা স্কুল সমষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পর্ষৎ-কে সাহায্য করবেন কর্মশিক্ষা বিষয়ক তথ্যের আদান-প্রদান কার্যে।

ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সব ছেলেমেয়েদের জন্য কর্মশিক্ষা আবশ্যিক করা হয়েছে। পর্ষৎ-এ ঘোষণা অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত· exposure stage অর্থাৎ প্রস্তুতি পর্ব, এবং নবম ও দশম শ্রেণী দুটি involvement stage অর্থাৎ কর্ম-পর্ব। এই দু'পর্বে ক্লাস-পরীক্ষা কি ধরনের হবে, কেমন ভাবে নম্বর দেওয়া যাবে ও সিলেবাসের বিষয়-বস্তুই-বা কতটুকু হবে ইত্যাদি প্রশ্ন স্বভাবতঃই এসে পড়ে।

প্রস্তুতি-পর্ব ও কর্ম-পর্ব, উভয় ক্ষেত্রেই পরীক্ষা গ্রহণের অর্থ হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রী কতটা শিখেছে তা যাচাই করা আর সেই অনুযায়ী মার্ক দেওয়া। কিন্তু পরীক্ষার আরো একটি উদ্দেশ্য আছে, যেটি সচরাচর সহজে স্মরণে আসে না। শিক্ষণ বা শিক্ষাব্যবস্থায় কোথায় কতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে·তাও স্পষ্টতর হয়ে ওঠা উচিত পরীক্ষা গ্রহণের ভেতর দিয়ে। ছাত্র-ছাত্রীদের কৃতিত্ব, তাদের মানসিক প্রবণতা, পরীক্ষায় সাফল্য-অসাফল্যের প্রভৃতি বিষয়ে বিশদ বিবরণ সংগ্রহ পরীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রস্তুতি-পর্বে একদিকে ছেলেমেয়েরা বড়দের কাজ করতে দেখবে অপর দিকে নিজেরা কতকগুলি প্রাথমিক কাজ করতে শিখে ভবিষ্যতের জন্য তৈরী হয়ে উঠবে। তাদের সেই সব সহজ কাজগুলির একটা নির্দিষ্ট তালিকাও থাকবে। কোন্ ছেলে কোন্ কাজ কতটা শিখেছে তারও পরীক্ষা মাঝে মাঝে নিতে হবে। স্কুলে তার রেকর্ড থাকবে ছাত্র-ছাত্রীর নামে নামে, তাদের Work Book বা কাজের বইতে।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। কোনো একটি স্কুলে নবম শ্রেণীর জন্য স্কুলের মাঠে সব্জী এবং ফুল-ফলের চাষের একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। তাতে ক্লাসের ২০টি ছেলে কাজ করছে। আর ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছেলেরা লক্ষ্য করছে তারা মাঠে প্লট ভাগ ক'রে এক এক প্লটে ৫ জন মিলে মাটি তৈরী প্রভৃতি

যাবতীয় কাজগুলি কেমন নিয়মিত ভাবে করে চলেছে। তারা এই ভাবে শুধু যে নিজের হাতে কাজ করা শিখছে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে তারা জানছে ঃ—

(১) কি ভাবে ছোট ছোট হাতিয়ার ব্যবহার করতে হয় ;

(২) কেমন ভাবে মাটি থেকে আগাছা পরিষ্কার করতে হয় ;

(৩) কি উপায়ে মাটি তৈরী করতে হয় ;

(৪) কোন্ সার কি ভাবে প্রয়োগ করতে হয় ;

(৫) জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা কি ভাবে করতে হয় ;

(৬) বাইরের শত্রু থেকে কি ভাবে গাছকে রক্ষা করতে হয় ;

(৭) কেমন ভাবে চাষের কাজের হিসাব রাখতে হয়, ইত্যাদি।

রুটিন করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ক্লাসের সব ছেলেকে এসব কাজ শেখানো যায়। কোন্ কাজে কে কতটা নিপুণতা অর্জন করল তার পরিমাপ রাখাও সম্ভব। এক অর্থে এরই নাম পরীক্ষা। ভাল-মন্দ-মাঝারির গ্রেডিং বা মার্কিং—প্রত্যেকের পারদর্শিতার খতিয়ান। সারা বছরের হিসাব একত্র ক'রে মার্ক দেওয়াটা তখন সহজতর হবে এবং cumulative record দিয়ে বোঝানো যাবে ফাইন্যাল পরীক্ষায় মার্ক পাবার যোগ্যতা কার কতখানি।

চাষের কাজের ন্যায় শিল্প কাজেরও এইরূপ প্রাথমিক কর্মের তালিকা প্রণয়ন সম্ভব। তাছাড়া প্রস্তুতি-পর্বে বিদ্যার্থীদের মধ্যে সু-অভ্যাস গঠন (habit formation) ও প্রবণতা সৃষ্টি (attitude development) করা আবশ্যক। কর্মশিক্ষা প্রসারের জন্য কি গ্রামের স্কুলে, কি শহরের স্কুলে, ছেলেমেয়েদের সকলের মধ্যে কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষাদান একান্ত প্রয়োজন। পরীক্ষাটা হবে সেই পথে সফলতা অর্জনের সহায়ক। তাই লিখিত পরীক্ষার সঙ্গে মৌখিক পরীক্ষারও প্রবর্তন করা হয়েছে। পর্ষৎ এ বিষয়ে যথাসময়ে স্কুলগুলিকে জানিয়ে দেবেন কি ভাবে মৌখিক পরীক্ষা ও কাজের পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। বিদ্যার্থীদের

মধ্যে সুঅভ্যাস গঠন এবং কর্ম-প্রবণতা সৃষ্টি করার ব্যাপারে অনেক বিদ্যালয়, বিশেষতঃ আবাসিক বিদ্যালয়গুলি অনেকখানি এগিয়ে আছে, সন্দেহ নেই। তাদের উদ্যম প্রশংসনীয়। বিদ্যার্থীরা এবং পরোক্ষভাবে অভিভাবকরা এতে উপকৃত হন। কিন্তু প্রচলিত পাঠক্রমে বা পরীক্ষা ব্যবস্থায় এর স্বীকৃতি ছিল না এত দিন। এখন সেই সকল কাজের যথার্থ মূল্যায়ণের সময় এসেছে। ছাত্রাবাসে বা আপন গৃহে নিজের কাজ নিজে ক'রে ছাত্রছাত্রীরা কতখানি কর্মাভিমুখী হয় তার হিসাব-নিকাশ করা পরীক্ষার অঙ্গ। এসব কাজে যেমন শ্রম লাগে, তেমনি দরকার হয় উপস্থিত বুদ্ধির ও কলাকৌশলের। উপযুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে ওগুলির সঠিক পরিমাপ নিরূপণ করা সম্ভব। এই standardisation-এর কাজে এগিয়ে আসবেন উৎসাহী শিক্ষক-সমাজ, আর পর্ষৎ সেই কাজে উৎসাহ দিয়ে তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ ফলাফলকে ভবিষ্যতে কাজে লাগাবেন।

কর্মশিক্ষা ঃ প্রস্তুতি ও সম্ভাবনা

কর্মশিক্ষার উদ্দেশ্য সফল করতে হলে যেমন অনেক কিছু উপকরণের প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন—প্রস্তুতিরও। সেই দিকে কতটুকু ব্যবস্থা ইতিমধ্যে হয়েছে এবং স্কুলগুলিই-বা তার জন্য কতটুকু তৈরী, তার একটা ধারণা থাকা দরকার।

স্কুলগুলি কতখানি প্রস্তুত জানা নেই; তবে দেশ প্রস্তুত। শিক্ষা ও শিক্ষা-ব্যবস্থার অবক্ষয় দেশবাসী আর সহ্য করতে রাজী নয়। স্কুল-কলেজের শিক্ষা পুঁথিসর্বস্ব হওয়ার দরুন অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। এর জন্য মূল্যও তাঁদের কম দিতে হয় না। তাই এর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগে দেশবাসী সোচ্চার। আশু শিক্ষা-সংস্কারের দাবী প্রায় সার্বজনীন। দেশবাসী চাইছে শিক্ষা জীবনমুখী এবং অর্থবহ হোক।

লেখাপড়ার ক্ষেত্রে এই কর্মশিক্ষার প্রবর্তন আজ নতুন আশার সঞ্চার করেছে। ব্যবস্থাপনার ত্রুটি যেন অভিভাকবৃন্দকে আশাহত না করে, এটি দেখতেই হবে। পর্ষৎ সে সম্পর্কে কৃতসঙ্কল্প। সরকারও তাই। নীতিগত ভাবে শিক্ষকদের অধিকাংশই মেনে নিয়েছেন কর্মশিক্ষার আবশ্যকতা। এখন কর্মশিক্ষাকে কার্যকরী করতে হলে চাই,—

(১) কর্মশিক্ষার সিলেবাসের অন্তর্গত এক-একটি কর্মপ্রকল্প সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ—যা শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সাহায্য করবে ক্লাস নিতে ও ছেলেদের দিয়ে কাজ করাতে।

(২) বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য আনুষঙ্গিক ব্যয়বরাদ্দ—যা এবিষয়ে স্কুলের আর্থিক অনটন দূর করবে।

(৩) সাংগঠনিক সাহায্য—যা পেলে স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ সহজেই কাজ চালু করতে পারবেন।

(৪) প্রয়োজনসংখ্যক শিক্ষক-পদের জন্য মঞ্জুরী প্রদান—যার ফলে কাজের দায়-দায়িত্ব বিন্যাসে অসুবিধা থাকবে না।

(৫) উপযুক্ত প্রশিক্ষণ—যা পেলে শিক্ষকবৃন্দ কর্মশিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ হবেন।

(৬) কর্মশিক্ষা বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণের নীতি নির্ধারণ—যাতে শিক্ষকগণ বুঝতে পারেন ছাত্রছাত্রীদের কিভাবে কতটা প্রস্তুত করতে হবে।

(৭) প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম—যেগুলি কর্মশিক্ষার কাজের উপযোগী।

(৮) অনুকূল পরিবেশ—যার অভাবে কোন সিলেবাসই ঠিকমতো কার্যকরী হয় না।

এই আটটি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে পর্ষৎ চিন্তা-ভাবনা করেছেন নতুন পাঠক্রম রচনার শুরু থেকেই। এমন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে যাতে তা প্রচলনে স্কুলগুলি কোনো বাধার সম্মুখীন না হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পর্ষৎ বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে কার্যকরী পন্থা অনুসরণ করছেন। আশা করা যায় শিক্ষকসমাজের সহযোগিতায় সকল অসুবিধা দূরীভূত হবে।

প্রথমতঃ, জ্ঞাতব্য বস্তু সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা জন্মানোর জন্য কর্মপ্রকল্পের বিশদ বিবরণ অবশ্যই চাই। কিন্তু সেই বিবরণ সংগ্রহের দায়িত্ব পর্ষৎ-এর সঙ্গে বিদ্যালয়ের কর্মী এবং শিক্ষকবৃন্দকেও সমভাবে গ্রহণ করতে হবে। বই পড়ে পাক-প্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া যায়, কিন্তু খাদ্য প্রস্তুত করতে হলে চাই

রান্নার কাজে হাত দেওয়া। তেমনি আবার মৌমাছি পালনের পুস্তক পাঠ করলেই মধু সংগ্রহের কৌশল আয়ত্ত করা যায় না। সাড়ে-চার হাজার হাই স্কুলে কোথায় কোন্ প্রকল্প কার্যকরী হবে তার সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা অপেক্ষা বেশী প্রয়োজন সেই কাজে হাত দিয়ে উপযোগিতা নির্ণয় করা।

পর্ষৎ ইতিমধ্যে একটি C. D. S. Cell গঠন করেছেন। C. D. S. অর্থে Curriculum Development Study। এক-একটি প্রকল্পকে কেন্দ্র ক'রে কর্ম ও শিক্ষার সমন্বয় কিভাবে সাধিত হতে পারে, তার অনুশীলন বা গবেষণা এই 'সেল' ক্রমাগত ক'রে যাবেন। পর্ষৎ-এর বিধি-নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক স্কুল কী কী প্রজেক্ট নবম শ্রেণীর জন্য স্থির করেছেন তা জানিয়ে অনুমোদন চাইবেন। অনুমোদন দেবার সময় পর্ষৎ ব'লে দেবেন প্রত্যেকটি প্রজেক্ট সম্পর্কে স্কুলের করণীয় কি আছে। তখন স্কুল থেকে পাওয়া নির্দিষ্ট প্রস্তাবের ভিত্তিতে পর্ষৎ নির্দিষ্ট নির্দেশপত্র প্রদান করবেন। তাছাড়া, এক-একটি প্রজেক্টের ওপর সাধারণ ভাবে জ্ঞাতব্য বিষয়ের পুস্তিকাও প্রকাশিত হবে। কিন্তু তার জন্য অযথা অপেক্ষা করে কাল-বিলম্ব করার কোন যুক্তি নেই।

দ্বিতীয়তঃ, প্রজেক্টের জন্য অর্থের প্রয়োজন অবশ্যই আছে; যদিও বিনা ব্যয়ে বা নামমাত্র ব্যয়ে কোনো কোনো কাজ করা সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্কুলে স্কুলে ওয়ার্ক এডুকেশন চালু করার জন্য বর্ত্তমান বর্ষে (১৯৭৪-৭৫) এক-কোটি টাকার কিছু বেশী অর্থ বরাদ্দ করেছেন। তা থেকে আসবাবপত্র খরিদের ও আনুসঙ্গিক খরচের কিছুটা 'অনুদান' হিসাবে পাওয়া যাবে। তবে বরাদ্দ অর্থের সদ্ব্যবহারের জন্য চাই স্কুলসমূহের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন-মূলক বিভাগগুলিও সীমিত সাহায্য করতে প্রস্তুত যদি স্কুলগুলি সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে পারেন।

এ ছাড়া দেশের বেসরকারী সংস্থা এবং ব্যাঙ্কের সাহায্যও স্কুল কর্তৃপক্ষ নিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে তাঁদের অনুমোদিত প্রকল্পের সঙ্গে স্কুলগুলিকে

সহযোগিতা করতে হবে। উৎপাদনমূলক প্রকল্পে এ সব ক্ষেত্রে সাহায্য দান বা ঋণ-দানের একটা নির্দিষ্ট নীতি আছে। কাজ করতে চাইলে এবং অর্থের সদ্ব্যবহারের যথার্থ সম্ভাব্যতা থাকলে অর্থ সংগ্রহ খুব একটা শক্ত কাজ নয়। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে বেসরকারী স্কুলগুলি আমাদেরই দেশে গড়ে উঠেছে সহৃদয় দেশবাসীর দানে এবং সদিচ্ছায়। আজ তাঁদেরই ছেলেমেয়েদের জন্য কার্যকরী শিক্ষার আয়োজনে সাড়া মিলবে না, এ আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক।

তৃতীয়তঃ, মনে রাখতে হবে টাকাটাই সব কথা নয়, বিশেষতঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে। শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের involvement বা অংশগ্রহণের প্রশ্ন যেখানে জড়িত, সেখানে সংগঠনের প্রয়োজন অনেকখানি। সে সংগঠন গড়ে তোলা চাই স্কুলের ভিতরে এবং বাইরে। দুই-ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কর্মশিক্ষা এবং সমাজসেবা যদি শিক্ষার অঙ্গ হয় তাহলে তা স্কুলের চার দেওয়ালের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না। তেমনি লেখাপড়াটা অফিস টাইমের মতো দশটা-পাঁচটার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সুতরাং সমাজের বিস্তৃততর ক্ষেত্র থেকে শিক্ষার উপাদান সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত সাংগঠনিক ব্যবস্থা চাই। আর চাই স্কুলের অভ্যন্তরে শিক্ষকদের টিম-ওয়ার্ক বা একজোটে কাজ করার মনোভাব। কর্মশিক্ষার জন্য এক বা একাধিক শিক্ষক নির্দিষ্ট থাকলেও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে স্কুলের সকল শিক্ষককেই কিছু না কিছু অংশগ্রহণ করতে হবে। সাধারণ শিক্ষার পুনর্বিন্যাসে এটি সব দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সেই কারণে বর্তমান 'ষ্টাফ প্যাটার্ণের' পরিবর্তন দরকার। ক্র্যাফ্‌ট টিচার যেখানে আছেন তিনি হাতের কাজ করাবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু কর্মপ্রকল্পে যথাসম্ভব সকল শিক্ষকই কিছু-না-কিছু দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। বিজ্ঞানের শিক্ষকদেরও এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে যুক্ত হতে হবে।

প্রশ্ন হতে পারে, একটা ক্লাসের রুটিনে কর্মশিক্ষার জন্য সপ্তাহে চার পিরিয়ড যদি থাকে তাহলে তার ভাগ-বন্টন (distribution) কেমন ভাবে হবে। সে ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, এই পিরিয়ড ভাগ কতকটা notional, অর্থাৎ ধারণাগত। আসলে এমন হতে পারে যে, নির্দিষ্ট ঘণ্টার পরিবর্তে অন্য সময়ে বা অন্য দিনে এটির adjustment দরকার হবে। কোনো স্কুল যদি প্রয়োজনবোধে সপ্তাহের একটা দিনে কোনো বিশেষ কাজ বেশী সময়ের জন্য করাতে চান, তাহলে অন্য দিনে রুটিনে সেটা exchange বা বিনিময় করা চলবে। প্রয়োজনবোধে ছুটির দিনগুলির-ও কিছুটা অংশ স্কুল প্রজেক্টের কাজে লাগানো যেতে পারে। কিভাবে man-power ও resources বা শক্তি-সামর্থ্য কাজে লাগানো হবে তা নির্ভর করবে সংগঠনের উপর। প্রধান শিক্ষকদের সারা বছরের জন্য একটা পরিকল্পনা তৈরী করে নিতে হবে, যার ফলে স্কুলের বাইরের সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার করা যাবে। কৃষি, কুটিরশিল্প, সমাজ-উন্নয়ণ প্রভৃতি সরকারী বিভাগের সাহায্য যাতে পূর্ণ মাত্রায় স্কুলের কর্মশিক্ষায় কাজে লাগে, তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় সেই ধরনের সংগঠনের কাজে সাহায্য করবেন জেলা কমিটিগুলি।

চতুর্থতঃ, নতুন পাঠক্রমকে কার্যকরী করার জন্য উপযোগী এবং উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক চাই, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পুরানো সিলেবাসে craft teaching আবশ্যিক থাকলেও, ফাইন্যাল পরীক্ষায় তার স্থান ছিল না ব'লে হাতে-কলমে কাজ শেখানোর জন্য উপযুক্ত শিক্ষক সর্বত্র ছিল না ; থাকলেও তাঁরা ছিলেন অনেকটা অনাদৃত।

কর্মশিক্ষা প্রসারের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে ষ্টাফ প্যাটার্ণের পরিবর্তন করা হচ্ছে। ফলে, প্রতিটি স্কুলের জন্য প্রয়োজন-মতো বাড়তি শিক্ষক-পদ সৃষ্টি করা যাবে। কোথায় কতটা তা হবে, সে সম্বন্ধে নীতি নির্ধারিত হচ্ছে। তবে সাধারণ শিক্ষার কারিকুলামে subject teacher-এর

সংকীর্ণ সংজ্ঞা পরিহার করতে হবে। সকল শিক্ষকই সাধারণ শিক্ষকের ভূমিকা অবলম্বন করবেন, এইটাই বাঞ্ছনীয়। কর্মের সঙ্গে শিক্ষার সম্পূর্ণ সংযুক্তিকরণ তখনই সার্থক হবে, যখন শিক্ষক মাত্রেই কর্ম এবং পঠন-পাঠনের দায়িত্ব সমভাবে বহন করবেন।

পঞ্চমতঃ, সেই দায়িত্ব বহন করতে হলে শিক্ষকদের মানসিক প্রস্তুতি দরকার। তার জন্য জনে জনে বাইরের ট্রেনিং নিতে হবে, এটা ঠিক নয়। প্রশিক্ষণের অর্থ সর্বক্ষেত্রে স্কুল ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে টেনিং নেওয়া নয়। স্কুলের কাজের মধ্যেই প্রশিক্ষণ হতে পারে যদি শিক্ষক আগ্রহী হন। Formal training-এর চাইতে কর্মমাধ্যম-প্রশিক্ষণ অনেক বেশী কার্যকরী। তাই কর্মশিক্ষা বিষয়ে স্বাধ্যায় এবং আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করার উপর পর্ষৎ বেশী পরিমাণে গুরুত্ব দিয়েছেন। জেলায় জেলায় স্বল্পকালীন আলোচনা চক্র (Orientation Seminar) এবং শিক্ষাক্রম অনুশীলন (C. D. S.) অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং হবে। প্রত্যেক school complex-এর জন্য নিয়মিতভাবে শিক্ষণ-শিবির (Self-study Camp) পরিচালনার ব্যবস্থা হতে পারে। শিক্ষক এবং প্রধানশিক্ষকগণ তাঁদের অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান করতে পারবেন এই সব শিবিরে যোগদান করে। তাছাড়া কর্মশিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যাদির পুস্তিকায় কর্মশিক্ষার রূপরেখা সকলের কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠবে।

ষষ্ঠতঃ, কর্মশিক্ষার জন্য ফাইন্যাল পরীক্ষায় আপাততঃ ৫০ নম্বর নির্দিষ্ট হয়েছে। সেই পরীক্ষা কেমনভাবে নেওয়া হবে, কোন্ মান অনুযায়ী মার্ক নির্ধারিত হবে, এ নিয়ে অনেকের মনে হয়তো সংশয় আছে। যেহেতু এই ধরনের বিষয় আগে পরীক্ষাভুক্ত ছিল না, সেজন্য শিক্ষকগণ অনেকক্ষেত্রে অনুমান করতে পারছেন না শিক্ষার্থীদের বাইরের পরীক্ষকদের কাছে কি ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীনহতে হবে,

কিংবা কিভাবে কাজের রেকর্ড রাখতে হবে। এ বিষয়ে পর্ষৎ কর্তৃক কতগুলি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে :

(১) নবম ও দশম শ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী অন্ততঃ দুটি প্রজেক্ট ওয়ার্ক করবে, যা হবে উৎপাদনমূলক ও যার শিক্ষাগত মূল্য আছে।

(২) এই কাজে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে একক বা দলগতভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে (বিকলাঙ্গ বা শারীরিক শ্রমে সম্পূর্ণ অসমর্থ বিদ্যার্থী ব্যতীত)।

(৩) প্রত্যেকের কাজের রেকর্ড রাখতে হবে। ওয়ার্ক বুকে তা নিয়মিত ভাবে লেখা থাকবে এবং সেই বইগুলি স্কুল কর্তৃক সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হবে।

(৪) ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্য সেই সকল ওয়ার্ক বুক উপস্থাপিত করতে হবে পর্ষৎ-নিযুক্ত পরীক্ষকদের কাছে।

(৫) কোন্ ছাত্র কোন্ গ্রুপে বা দলে একত্রে কাজ করেছে তার রেকর্ড থাকবে।

(৬) পর্ষৎ কর্তৃক অনুমোদিত ফরমূলা অনুযায়ী কাজের মূল্যায়ণ হবে এবং গ্রুপের প্রত্যেককে তদনুসারে মার্ক দেওয়া হবে।

(৭) পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিগত কর্মকুশলতা নিরূপণের জন্য বাইরের পরীক্ষকগণ কাজের রেকর্ডের ভিত্তিতে মৌখিক প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করবেন এবং পরীক্ষকগণ যুক্তভাবে বিচার-বিবেচনা করে মার্ক দেবেন। প্রয়োজনবোধে কাজের নমুনাপরীক্ষাও হতে পারে। কি ধরনের প্রশ্ন কোন্ কাজের উপর হতে পারে তার আভাস সহ প্রয়োজনীয় নির্দেশ-পত্র পর্ষৎ কর্তৃক প্রত্যেক স্কুলে যথা-সময়ে প্রেরিত হবে।

৮। পর্ষৎ কর্তৃক নিযুক্ত প্রধান পরীক্ষক এবং 'রিভিউ বোর্ড' চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর মার্ক স্থির করবেন।

পরীক্ষাগ্রহণ নীতি সম্বন্ধে অনুশীলন এবং গবেষণার প্রয়োজন আছে। পর্ষৎ এ কাজে হাত দিয়েছেন। শুধু কর্মশিক্ষা নয়, অন্যান্য বিষয়েও মার্ক দেওয়ার বিধি-নিয়মের সংস্কার সাধন দরকার। বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই পরীক্ষা-গ্রহণের পরিচ্ছন্ন রীতিনীতি গড়ে উঠুক, এটি সকলের কাম্য।

সপ্তমতঃ, কর্মশিক্ষা প্রচলনের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। যে-সব উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে Agriculture, Technical, Home Science প্রভৃতি stream-এর যন্ত্রপাতি বা সাজ-সরঞ্জাম আগে থেকেই আছে, সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে হবে। Craft teaching-এর জন্য যা আছে তারও উপযুক্ত ব্যবহার চাই। স্কুলগুলির জন্য যেটুকু সাজ-সরঞ্জাম (equipment) দরকার, তার ব্যবস্থা প্রকল্পভিত্তিক হওয়া উচিত, অন্তত অপব্যয় বন্ধের উদ্দেশ্যে। প্রত্যেক স্কুল তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনের তালিকা ও বরাদ্দ তৈরী করে অনুমোদনের জন্য পাঠাবেন পর্ষৎ এবং সরকারের নিকট। সরকারী অনুদান এবং অন্যান্য সংস্থা থেকে সাহায্য সেই অনুযায়ী নিয়মিত হওয়া দরকার। কর্মশিক্ষার রূপায়নে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমান বর্ষে যে ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করেছেন তার সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে সকলকে সচেতন হতে হবে। কাজকে যথার্থ উৎপাদনমূলক করতে পারলে তা থেকে কিছুটা আয়ও হতে পারে। সেই আয়ের কিয়দংশ ছাত্র-ছাত্রীর ও শিক্ষকদের কল্যাণে ব্যয়িত হতে পারে। নিদর্শন স্বরূপ বলা যায় যে, উৎপাদনলব্ধ নীট আয় জমা হতে পারে এইভাবে—

(ক) কর্মশিক্ষা তহবিলে (Work Education Fund)—২৫%

(খ) শিক্ষক-কল্যাণ তহবিলে (Teachers' Welfare Fund)—২৫%

(গ) ছাত্র-কল্যাণ তহবিলে (Students' Welfare Fund—৫০%

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীরা উৎপাদনমূলক কাজের মাধ্যমে নিজেরাই নিজেদের টিফিন খরচ উপার্জন করে নিতে পারবে।

অষ্টমতঃ কর্মশিক্ষার সার্থক রূপায়ণে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন অনুকূল পরিবেশ। তার জন্য উদ্যোগ চাই। স্কুল-শিক্ষা সম্বন্ধে বারবার ব্যর্থতার কথাটা উচ্চারণ করে লাভ নেই। শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে কর্মশিক্ষা এক নতুন ভাবনা এবং নতুন চ্যালেঞ্জ। যাঁরা চান শিক্ষা আরও অর্থবহ হোক, আরও জীবনমুখী হোক, তাঁদের দৃঢ় সংকল্প ও চিন্তা-চেতনা শিক্ষার ক্ষেত্রে একদিকে নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করবে, আর অন্যদিকে সামাজিক রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করবে। পরিবেশ আপনা হতেই অনুকূল হবে যদি লক্ষ লক্ষ কিশোর-কিশোরীর মনে পরীক্ষাভীতের পরিবর্তে শিক্ষায় সাফল্যের নতুন আশা সঞ্চারিত হয়। মধ্যশিক্ষার পুনর্বিন্যাসের সেটাই অন্যতম উদ্দেশ্য। এবং যে উদ্দেশ্য সাধিত হবে শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগীর সক্রিয় সহযোগিতায়।

কর্মশিক্ষায় সংযুক্তিকরণ

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র
ভাবে দেখতে আমরা অভ্যস্ত। বলা নিষ্প্রয়োজন অনেকদিনের অভ্যাস-গত
এই ধারণার পরিবর্তন অনিবার্য বিশেষতঃ শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক
স্তরে। শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হলে, পাঠ্যবস্তুকে অন্বয়
সূত্রে গ্রথিত করার কৌশলটি আয়ত্ত করা বিশেষ প্রয়োজন। স্কুলের পঠন-পাঠনে
তার সম্যক প্রতিফলন চাই। কর্মশিক্ষাকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হবে
বিজ্ঞান, সাহিত্য, গণিত, ভূগোল এবং ইতিহাস। এই ভাবেই শিক্ষার সমগ্র
পরিধি রচিত হবে। যা কিছু শিক্ষণীয় আছে, তার পারস্পরিক সংযুক্তিকরণ
সম্ভব কর্মশিক্ষার মাধ্যমে। সেই কারণে, কর্মশিক্ষা কোনো নির্দিষ্ট এবং স্বতন্ত্র
সত্ত্বার বিষয় নয়। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী। ব্যাপক অর্থে কর্ম বহু-
বিস্তৃত এবং জীবনব্যাপী। শিক্ষাও তাই। সুতরাং এদের সমীকরণ সহজলভ্য।
মানুষের জীবনযাত্রা এই দুয়ের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত। কর্মের অপরিসীম
ক্ষেত্র থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে শিক্ষার উপাদান আহরণ এক অনিবার্য এবং
স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। শিক্ষার্থী সেই প্রক্রিয়ার প্রথম পাঠ নেবে নব-প্রবর্তিত
সাধারণ শিক্ষার আয়োজনে, আপন আপন বিদ্যায়তন, গৃহকোণ এবং সামাজিক
পরিবেশ থেকে। শিক্ষাগ্রহণের সেই সহজ পন্থা আবিষ্কারে সাহায্য করবে
কর্মশিক্ষা। তাই পাঠক্রমে কর্মশিক্ষার স্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিদ্যালয়
পর্যায়ে শিক্ষার রূপান্তর এক মৌলিক পরিবর্তন, যার প্রভাব বিস্তৃত হবে
উচ্চশিক্ষার পরবর্তী স্তরে।

স্বীকার করি, এই সংযুক্তিকরণ অভ্যাস-সাপেক্ষ। একদিনে সব কিছু সফল হয় না। দীর্ঘদিনের পুঁথিগত বিদ্যাকে হঠাৎ সম্পূর্ণভাবে কর্মমুখী করাও সম্ভব নয়। বিষয়-বস্তুর পৃথকীকরণের নামে শিক্ষার রাজ্যে যে কৃত্রিম সংকীর্ণতা সৃষ্ট হয়েছে তা একদিনে দূরীভূত হতে পারে না। কিন্তু তাই বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকাও চলেনা। পর্ষৎ এবিষয়ে অগ্রণী হয়েছেন অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে এই আশায়।

নব-প্রবর্তিত পাঠক্রমে পাঠ্যবিষয় সমূহকে প্রাথমিকভাবে চারটি গ্রুপ বা সমষ্টিতে ভাগ করা হয়েছে দুটি কারণে। প্রথমতঃ, এর ফলে একাধিক 'সাবজেক্ট' বা বিষয়ের পারস্পরিক পরিপুষ্টির ধারণাটি স্পষ্টতর হয়ে উঠবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মনে। দ্বিতীয়তঃ, পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা গ্রহণে একে অপরের সহায়ক হবে মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গণিত ও বিজ্ঞানের কথা। এই দুটি বিষয় যে নিকট সম্বন্ধযুক্ত, সেকথা সকলের জানা থাকলেও, তার ব্যবহারিক প্রয়োগ কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়। অথচ বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে গণিত এবং গণিতের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান পরিবেশিত হলে, বিদ্যার্থী দুটি বিষয়েরই সম্যক আস্বাদ পেতো ও উপকৃত হতো। বিজ্ঞান পড়াতে গিয়ে কিভাবে গণিত ও গণিত শেখাতে গিয়ে কিভাবে বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ জাগানো যায় সে-দিকে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হয় না। অথচ কি জড়-বিজ্ঞান, কি জীবন-বিজ্ঞান দুইই বহুলাংশে নির্ভরশীল যুক্তিনিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণের ওপর। আর সেই বিচারণার সংখ্যাবাচক ও গুণবাচক স্বরূপটি প্রকাশ করে গণিত-বিদ্যা। এক অর্থে বিভিন্ন বিজ্ঞানের মধ্যে সেতু হলো গণিত।

দেশ ও দেশবাসীকে ঠিকমতো চেনা এবং জানার জন্য ইতিহাস ও ভূগোলের একত্রীকরণ একই কারণে কাম্য। এদুটি বিষয় আপাত দৃষ্টিতে পৃথক পরিগণিত হলেও এরা যেন একই বৃক্ষের দুটি শাখা। নতুন সিলেবাসে

তাই তাদের স্থান একই বিষয়ের দুটি পত্র হিসাবে। বিদ্যার্থী প্রথম থেকেই পরিচিত হোক দেশের মৃত্তিকা ও তার অবয়ব-সংস্থানের সঙ্গে। নদ-নদী, বন-জঙ্গল, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ ও নানাবিধ প্রাকৃতিক সম্পদ্ তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করুক। আবার দেশবাসীর ইতিবৃত্তের পঠন-পাঠনে, তাদের মনে পুরাতনের সঙ্গে নতুনের যোগসূত্রটি স্থাপিত হোক। বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাটি কেমনভাবে সকল ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিভিন্নতাকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছে তার যথার্থ পরিচয় তারা পাক। বস্তুতপক্ষে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার সেই সামগ্রিক রূপটি তুলে ধরতে হবে বিদ্যার্থীদের মনে। আর তার জন্যই প্রয়োজন বিষয়-বস্তুর সংযুক্তি করণের।

একই কারণে, প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাষা স্থান পেয়েছে একটি গ্রুপে। তাদের পরস্পর বর্ণ-মালা পৃথক, শব্দসমষ্টি বিভিন্ন; প্রকাশভঙ্গি স্বতন্ত্র হ'তে পারে কিন্তু আবেগ, অনুভূতি ও আত্মপ্রকাশের ছন্দ একই। সেই অভিন্নতা, সেই মূল সুর ধ্বনিত হওয়া চাই সাহিত্য পাঠে। মধ্যশিক্ষার পাঠক্রমে তিনটি ভাষার সমাবেশ অনেকখানি সেই উদ্দেশ্যে। মাতৃভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই সেটি প্রথম ভাষা। দ্বিতীয় ভাষা এবং তৃতীয় ভাষায় শিক্ষাগত মান বা attainable standard প্রথম ভাষার সমান রাখা না হলেও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এগুলি হবে জীবনযাত্রার সহায়ক।

কর্মশিক্ষার সঙ্গে শরীরশিক্ষা ও সমাজসেবাকে একত্রিত করা হয়েছে গুনগত সমতার দিকে লক্ষ্য রেখে। শরীরশ্রম ও বুদ্ধিবৃত্তির সহযোগে কর্মশিক্ষায় নৈপুণ্য অর্জন অনেক পরিমাণে নির্ভর করে সফল শরীরচর্চা এবং সুঅভ্যাস গঠনের ওপর। সমাজসেবার সংযোগ সেক্ষেত্রে হবে সোনায় সোহাগা। আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা বর্জনের এটি একটি প্রকৃষ্ট পন্থা। সমাজকে

ভালবাসতে হলে, নিজের সময়, শ্রম ও সামর্থ্যের কিছুটা সমাজকে দিতেই হবে। এই আদান-প্রদানের আবশ্যকতা বোধ বিদ্যার্থীর মনে দৃঢ়মূল হলে সর্বস্তরে তার প্রতিচ্ছায়া পড়বে। তবেই জন্ম নেবে নতুন সমাজজীবন। আর সেইটি হবে শিক্ষার মূল্যবান অবদান।

কর্মপ্রকল্পে বিভিন্ন বিষয়ের সংযুক্তিকরণ, সাহিত্য-রস-সিঞ্চিত, বৈজ্ঞানিক যুক্তি-সম্মত এবং দেশ-পরিচিতি-সমন্বিত কর্মময় শিক্ষা একদিকে যেমন শিক্ষা-সংস্কারের কাজে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করবে, অন্যদিকে তেমনি জনজীবনে নতুন আশার সঞ্চার করবে।

তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক বিচার-বিবেচনা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক-সমাজ মধ্যশিক্ষা রূপান্তরের মূলসূত্রটি গ্রহণ ক'রে অবিলম্বে আপন বিদ্যায়তনে কর্মশিক্ষার সূত্রপাত করবেন, মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ সর্বতোভাবে এই আশা পোষণ করেন।